১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন
আনন্দমেলা
তুলসী সেনগুপ্তের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
খুদে ক্যামেরাম্যান

আমেলা—১ (১৪-১২-৮৩)

কি হারিয়েছে বলতো মা?

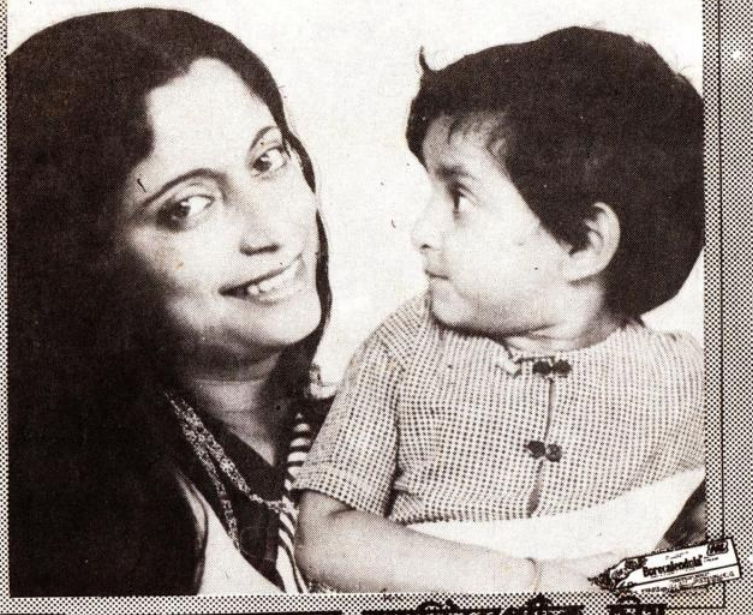

বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
শুধু বড়দের নয় – ছোটদেরও প্রিয়
বাড়ীর সবার প্রিয়

বোরো ক্যালেনডুলা*

আমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
খুদে ক্যামেরাম্যান ৫০
তুলসী সেনগুপ্ত
গল্প
কিংবদন্তির পাথর ৭
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
শোওয়া-পণ্ডিতের গল্প ১৪
কমলেন্দু চক্রবর্তী
রবার্টসাহেবের বাংলো ৩৮
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞান
বিজ্ঞানবিচিত্রা ৫
চঞ্চল পাল
বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ১৯
সন্তোষকুমার দে
ধারাবাহিক উপন্যাস
নোটোর দল ২৭
লীলা মজুমদার
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে ২৩
পঙ্কজ রায়
খেলাধুলো
ইডেনে : ফিরে চাও ৮৪
মণীশ মৌলিক
বোলার এখন ম্যানেজার ৮৫
অশোক রায়
উইকেটের ছড়াছড়ি ৮৬
মণি শর্মা
ছড়া
প্রশ্ন ও উত্তর ১৭
পবিত্র সরকার
বেচা-কেনা ২১
অশোক রায়চৌধুরী
সেমসাইড ৪১
অভীক বসু
সেইসঙ্গে কমিক্স, লেখাপড়া
কিশোর-ক্লাসিক, ধাঁধা-মজা
প্রচ্ছদ : জয়ন্ত ঘোষ

শনশন হাওয়া বয়,
আলো যায় মরে,
ঝরাপাতা মাঠময়
ছোটাছুটি করে।
মুখ ঢাকে কুয়াশায়
কালো রাত্তির,
নিমগাছে জমে যায়
জোনাকির ভিড়।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা

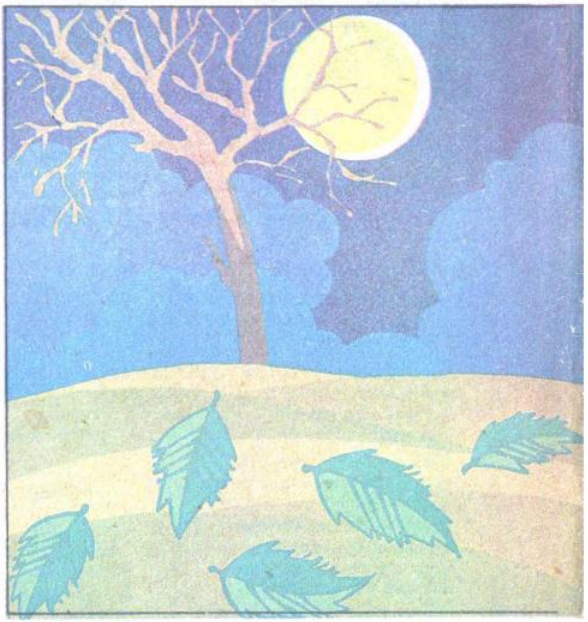

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তাড়াতাড়ি করুন! ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি লাগান
আপনার বাচ্চাকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়

ওর এই অনাবৃত ক্ষতে একটুও ধুলোবালি লাগলেও তা দূষিত হয়ে উঠতে পারে

সারা বিশ্বে মায়েরা অনাবৃত ক্ষতকে সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টির ওপর নির্ভর করেন।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টিতে আছে একটি প্রমাণিত এনটিসেপটিক যা ক্ষতের উপশমে সাহায্য করে। এর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাওয়া চলাচল করে ব'লে ক্ষতকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে সারিয়ে তোলে। তাছাড়া এতে আছে বেশী আরামদায়ক অনন্য একটি প্যাড যা চট্‌চট করে না।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টি নানা আকারে ও সাইজে পাওয়া যায়। গুরুতর ক্ষত, কাটা-ছ'ড়ে যাওয়া, যেখানে সাধারণত পট্টি লাগানোর অসুবিধে, ফোড়া ও ঘস্টানি — সব ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। হাতের কাছে **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টি রাখুন। সবসময়ে।

OBM/9283/BN

ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি

সংক্রমণের হাত থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে সুরক্ষিত রাখে

Johnson & Johnson

BAND AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON USA © JBJ 82

বিজ্ঞানবিচিত্রা

চঞ্চল পাল

যেখানে জল সেখানে আগুন

যেখানে জল সেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশি। শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক, কথাটা অন্তত এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে সত্যি। সম্প্রতি কানাডার ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড বিস্তারিত পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, বিমানে হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ার জন্য দায়ী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাথরুম। স্নান করা বা হাত ধোওয়ার জায়গায় যেসব বৈদ্যুতিক তার ও সরঞ্জাম থাকে তা অনবরত জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসার ফলে বিদ্যুৎ-অপরিবাহী আচ্ছাদনগুলোও হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ-পরিবাহী। এই কারণে সেইসব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিতে শর্ট-সার্কিট হয়ে ফিউজ তো হয়ই, ভয়ঙ্কর বিপদও ডেকে আনে। এই কারণে এখন থেকে এয়ার-কানাডার প্রত্যেকটা বিমান ওড়বার আগে তার বাথরুম ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দরকার হলে বাথরুমের বৈদ্যুতিক লাইনগুলো কয়েক মাস অন্তরই ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী

আজ থেকে ঠিক চার বছর পরে নবেম্বর মাসে ক্যালিফোর্নিয়া শহরে একটা মারাত্মক ভূমিকম্প হবে—ঘটনাটা ঘটবে কোনও পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় এবং ভোরবেলা বা সন্ধেবেলায়। ভবিষ্যদ্বাণীটা কোনও জ্যোতিষীর নয়, তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে এর হয়তো সম্পর্ক আছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এল· কিল্‌স্টন এই শহরের গত ভূমিকম্পগুলোর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছেন যে, ঠিক ১৮ বছর ৭ মাস অন্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা বড়সড় ভূমিকম্প ঘটেছে—সময়টা ছিল ভোরবেলা বা সন্ধেবেলা, দিনটা ছিল পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। কারণ খুঁজতে গিয়ে লক্ষ করা গেছে যে, চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর বিষুবরেখার উত্তরে একবার সরে যায়, দক্ষিণে আবার সরে আসে। চাঁদের কক্ষপথ একই অবস্থানে আবার ফিরে আসতে সময় লাগে প্রায় ১৮ বছর ৭ মাস। তাই এইসব ভূমিকম্পের সঙ্গে চাঁদের আকর্ষণের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, যদি থাকে তবে সেই আকর্ষণ কীভাবে এই শহরের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়, তা খুঁজে দেখা হচ্ছে।

সোঁ সোঁ ক'রে উড়বে আমার উড়োজাহাজ,
ডানা মেলে দূর-দূরান্তে ছুটবে যে আজ।
গাদা গাদা জেম্‌স তাতে ভাই আনব ভরে,
তুমি, আমি আর সবাই মিলে খাব মজা ক'রে!

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!

ক্যাডবেরিস্

চকোলেটস্

ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

OBM-9599-BN

কিংবদন্তির পাথর

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

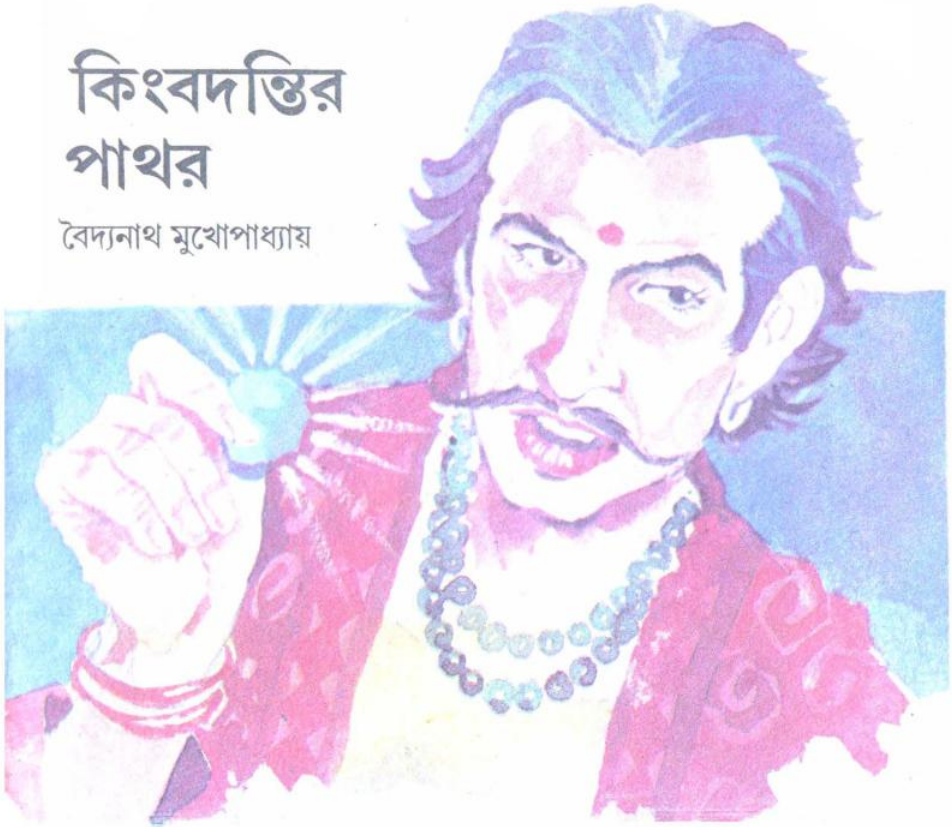

তেকড়ি দত্তের নাম জানে, এমন লোক একালে বিরল।

হাটখোলার দত্তরাও এ-নাম শুনে ঢোঁক গিলবেন। অথচ এই 'তেকড়ি'ই হলেন ওঁদের বংশের প্রবাদপুরুষ। তবে ওঁর আমলটা ছিল বেজায় পুরনো। মনে রাখবার সীমানার ভেতর আনা কঠিন। নবাব-বাদশাদের আমল। ইংরেজদের নয়। তেকড়ির কপালে তাই 'রায়সাহেব' বা 'রায়বাহাদুর' জোটেনি। জুটেছিল 'চৌধুরি'। লোকে বলত 'রাজা'।

আদি নিবাস ওঁর কোথায় ছিল, তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। পরে আন্দুলে এসে সরস্বতীর ধারে যখন পেল্লায় একটি রাজবাড়ি বানালেন, তৈরি করলেন দেবালয়, আরো পাঁচরকম কাণ্ডকারখানা করতে থাকলেন, তখনই লোকের চোখ পড়ল ওঁর দিকে। শহর কলকাতার জন্ম হতে তখনো অনেক দেরি, তাই এ-ইতিহাসটা পুরনো আমলের ওপাশ ঘেঁষেই রয়ে গেল।

তবে তেকড়ি যতই বিত্তশালী লোক হোন না কেন, দৈব অনুগ্রহ আলাদা করে তিনি পাননি। অঢেল বৈভব আর ঐ অনুগ্রহ একই সঙ্গে যিনি পেয়েছিলেন, তিনি হলেন রত্নাকর দত্ত। তেকড়ির

আহা কী বাহার,
কী রেশমকোমল চুল...
কী হাল্কা অচিন সুরভী...
কী মনভরানো আবেশ!
ধন্য হেলো শ্যাম্পু।

কত রকমের হেলো আছে দেখুন:

হেলো
এগ শ্যাম্পু।
প্রোটিন দিয়ে
চুলের পুষ্টি যোগায়॥

নতুন হেলো
গ্রীন অ্যাপেল
শ্যাম্পু।
যেমন চমৎকার
গন্ধ, তেমনই
চমৎকার যত্ন!

নতুন হেলো
হার্বাল শ্যাম্পু।
প্রকৃতির
নিজগুণে ভরা॥

হেলোর আবেশে
আহা মন ভরে যায়!

GK&E.B83.29 BN

ছেলে। তাই ওঁর জীবনটাও ছিল একটু অন্য ছাঁদের। একটু অস্বাভাবিক।

বাবা তেকড়ি আন্দুলে থাকলেও ছেলে রত্নাকর থাকতেন একটু তফাতে। বালিতে। ঠাকুরমার কাছে। গঙ্গার ধারেই বাড়ি। লোক-লশকর, দাস-দাসী সবই ছিল এ-বাড়িতে। ঠাকুরমা থাকতেন পুজো-আচ্চা নিয়ে। নাতিও ঐরকম, ভালবাসত ঠাকুর-দেবতা। পুজো করত মা গঙ্গাকে।

বছর-সতেরো যখন বয়স, ভারী একটা মজার ঘটনা ঘটল। স্নান করবার পর গঙ্গার কোলে বসে পূজাহ্নিক করছিলেন রত্নাকর। সঙ্গে তামার কোশাকুশি। একটু আগেই জোয়ার এসেছে। জলের ভারে টলমল করছে নদী। ঢেউয়ের তোড়ে হঠাৎ ছোট্ট একটি পাথর এসে লাগল তাঁর কোশায়।

'কী রে বাবা!' চমকে উঠে পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন রত্নাকর।

কিন্তু ঢেউগুলি এমনই দুরন্ত যে তারা আবার এসে সেই পাথরটিকে পৌঁছে দিয়ে গেল রত্নাকরের আহ্নিকের কোশাকুশিতে। রত্নাকর বিরক্ত হয়ে আবার সরিয়ে দিলেন সেই ছোট্ট পাথরের টুকরোটিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই পাথরটি ঢেউয়ের তোড়ে আবার চলে এল রত্নাকরের কাছে। মনে হল, কে যেন ওটাকে ওঁর কাছে জিম্মা রাখতে চায়।

আহ্নিকের তন্ময়তা এবার ছুটে গেল রত্নাকরের। সবিস্ময়ে চোখ মেলে ইনি দেখলেন যে এ পাথরটি মোটেই সাধারণ পাথর নয়। এর ছোঁয়াতে তামার কোশাকুশি হয়ে গেছে সোনা। এবং পাথরটি কেমন যেন দেখতে। রত্নাকর বুঝলেন যে ব্যাপারটি নির্ঘাত দৈব। মা গঙ্গার মাধ্যমে দেবী লক্ষ্মী যেন কিছু দিতে চাইছেন।

দৌড়ে গিয়ে রত্নাকর সব ঘটনা বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে বললেন। অলৌকিক পাথরটিকেও তুলে দিলেন ওঁর হাতে। ঠাকুরমাও পরীক্ষা করে দেখলেন। লোহার টুকরো মুহূর্তে সোনা হয়ে গেল। উনি বললেন, 'বাছা, এটা হল পরশমণি। ঈশ্বরের দয়ায় এটি তোমার কাছে এসে পৌঁছেছে। দেখো যেন জানাজানি না হয়।' ঠাকুমা এটিকে মাথায় ঠেকিয়ে ভরে রেখেছিলেন লক্ষ্মীর কৌটোয়। পরে খুব ফিসফিস করে বললেন, 'খুব সাবধানে ব্যবহার কোরো বাছা, খুব গোপনে। নইলে বিপদ হতে পারে।'

'পরশমণি!' নামটি শোনামাত্র রোমাঞ্চ হল রত্নাকরের। তবে খবরটা তিনি গোপনেই রাখলেন। তবু কেমন যেন অজানা এক আশঙ্কায় তাঁর বুকটা করতে থাকল দুরুদুরু।

কিছুদিন পরে ঠাকুরমা দেহরক্ষা করলেন। বাবা তেকড়ি দত্ত মায়ের শ্রাদ্ধ করলেন উপযুক্ত মর্যাদায়। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তবে রত্নাকরেরএ-কাজ তেমন যেন পছন্দ হল না। মনে হল, ঠাকুরমার কাজ আরো আড়ম্বরের সঙ্গে করা যেত। করা যেত আরো খরচ। যদি পরশপাথরটাকে একটু ব্যবহার করা যেত, তাহলে কথাই ছিল না! ঠাকুরমার নিষেধ ছিল বলে বেচারি এই গোপন কাজটি করতে পারলেন না। তাই মনে একটু দুঃখ রয়ে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে গড়িয়ে গেল বেশ কয়েকটি বছর। গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেল অনেক জল। বেশ পরিণত বয়সে তেকড়ি দত্ত চোখ বুজলেন।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বাবা থাকতেন আন্দুলে। আর রত্নাকর

থাকতেন বালিতে। ইতিমধ্যে রত্নাকরের বিয়ে-থা হয়েছে। এবং তা ঠাকুরমা বেঁচে থাকতেই। ছেলেও হয়েছে। মোটকথা, বেশ সংসারী হয়েছেন রত্নাকর। বয়সের সে উত্তেজনা আর নেই। তবে পরশমণিটা হাতে নিলেই মনটা কেমন যেন করে ওঠে। ভাবেন, এর ব্যবহারটা ঠিক যেন হয়ে উঠল না! বাবা তেকড়ির মারা যাবার খবর পেয়ে, এই পাথরের উত্তেজনাটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। মনে হল, পরশমণি ব্যবহারের এই হল সুবর্ণসুযোগ। এবং এটা আক্ষরিক অর্থেই।

আন্দুলে গিয়ে বাবার পারলৌকিক কাজের আয়োজন করতে থাকলেন রত্নাকর। এ-আয়োজন যেমন ছিল অঢেল, তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ। দেশ-দেশান্তরের লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হল। খাওয়ানো হল। ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য লোক পাঠানো হল কাশী-কাঞ্চী-মিথিলা। মায় দ্রাবিড় দেশ পর্যন্ত। এলেন পণ্ডিতসমাজ। ভিক্ষাজীবীরাও আহূত হলেন। এঁদের কেবল সুপ্রচুর ভোজ্যই দেওয়া হল না। সঙ্গে দক্ষিণা দেওয়া হল অপরিমিত সুবর্ণ।

এরকম অঢেল খরচ এবং সোনার ব্যবহার দেখে চারদিকে চাপা কৌতূহল

দেখা দিল। প্রশ্ন উঠল, তেকাড় দত্তের টাকাপয়সা ছিল ঠিকই, কিন্তু তা কি এত ?—এইভাবে নানারকম এ-কথা সে-কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল পরশমণির কথা। আর ব্যাপারটি এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে গেল যে স্বয়ং রত্নাকরও তা অস্বীকার করতে পারলেন না।

এরপরেই ঘটল অঘটন। খবর ছুটল আগুনের মতন। প্রথমে মুর্শিদাবাদে। সেখান থেকে সোজা আগ্রা। একেবারে বাদশাহের কানে। খবরের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে বাদশাহ একদল সিপাহি পাঠালেন। সঙ্গে এক ফৌজদার। ফৌজদার এসে ইয়া বড় একটা কুর্নিশ জানিয়ে বাদশাহের নির্দেশ পৌঁছে দিল রত্নাকরের কাছে, 'শাহানশা এত্তেলা পাঠিয়েছেন। আপনাকে আগ্রা যেতে হবে।' ফৌজদার আরো বলল, 'হুজুর, আপনার কাছে কী একটা যেন পাথর আছে, সেটাও জরুর নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

বাদশাহি ফৌজদারের এসব কথা শুনে বেচারি রত্নাকর বেজায় অসহায় বোধ করলেন নিজেকে। হতাশ হয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। চাকর-বাকরেরা দৌড়ে এসে ধরাধরি করে ওঁকে বাড়ির ভেতর

নতুন অধিক শক্তিশালী সুপার৭৭৭ ডিটারজেন্ট বার

এর শ্রেষ্ঠতার দাবি কেবল জোরদারই নয়, সেই দাবির অঙ্গীকারও বর্ণে-বর্ণে পালন করে।

এখন নতুন সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট বারে আমি পাচ্ছি সবচেয়ে অধিক সাদা কাচা। এর ডিটারজেন্ট ফর্মূলা আগের থেকেও ভাল হওয়ার দরুন, আগের চেয়ে অধিক ফেনা হয়, অধিক কাপড় ধোয় আর অধিক কাল চলে। এ সবের জন্যেই তো, এটা অন্য সব ডিটারজেন্ট বার বা সাবানের চেয়ে অনেক-অনেক ভাল।

ব্যবহার করে দেখুন ..আপনিও দেখে-দেখে অবাক হবেন আর বার-বার এটাই আনবেন।

Shilpi DM 2/83 Ben.

নিয়ে গেল। বিছানায় শুইয়ে দিল। গৃহিণী এসে পাখার বাতাস করতে থাকলেন।

খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর রত্নাকর ভাবলেন, পরশমণির কথাটা ফৌজদারের কাছে স্বীকার না করাই ভাল। এড়িয়ে গেলেই বাঁচা যাবে। নতুবা—

কিন্তু পরে মনে হল, স্বীকার না করলে বিপদ। অস্বীকার করলে ঝঞ্ঝাট আরো বেড়ে যাবে। ফৌজদার কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। উলটে চাপ দেবে। মারধোর করতে পারে। লুঠ করবে। ধর্ম নষ্ট করবে। তাই মিথ্যে না বলাই ভাল। এইরকম পাঁচসাত ভাবতে ভাবতে শেষে বাদশাহের ফৌজদারের সঙ্গে যাওয়াটাই ঠিক করে ফেললেন রত্নাকর। সঙ্গে নিলেন পরশমণি। সেই অলৌকিক পাথর।

বালি থেকে আগ্রা অনেক পথ। অনেক। তখনকার দিনে নদীপথে যাওয়াই ছিল সহজ। তাই নদী ধরে যাওয়াই ঠিক হল। সাজানো হল বজরা। বড় বজরা। আত্মীয়-পরিজনদের কাছে বিদায় নিয়ে রত্নাকর উঠলেন গিয়ে বজরায়।

না, মনটা কিছুতেই থিতু হয় না। বজরা একটু একটু করে ভেসে চলে, আর নানারকম চিন্তা এসে ভিড় করে রত্নাকরের মাথায়। ঘুম নেই। স্বস্তি নেই। কখনো আকাশের দিকে তাকান। কখনো নদীর ধারের গাছপালার দিকে। মনে মনে ভাবেন, মা গঙ্গার দেওয়া এ পরশমণি আমি কার হাতে তুলে দেব ? বাদশাহের হাতে ? না, মন মানে না।

বজরা এগিয়ে চলল। ত্রিবেণী ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আরো উত্তরে। কাঞ্চননগরের কাছে আসতেই রত্নাকর হা-হা করে হেসে উঠলেন। যেন আরেক মানুষ। ফৌজদারকে হেঁকে বললেন, 'আরে ফৌজদারজি, তোমরা পরশপাথর দেখেছ ?'

ফৌজদার দাড়ি চুমরে বলল, 'না।'

'একদম্ না ?'

'না।'

'তবে এই দেখো।' ছোট্ট একটি কৌটো থেকে রত্নাকর বের করলেন সেই পাথরটি। বজরার পাটাতনে পড়েছিল ভাঙা এক টুকরো লোহার শিক। সেটাতে পাথরটা ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফৌজদারজি, দেখুন তো এটা লোহার কি না !'

'তাজ্জব ! বিলকুল সোনা হো গিয়া !' বড় বড় চোখ করে ফৌজদার আর সিপাহিরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। রত্নাকর আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'এ পাথর আমাকে কে দিয়েছিল জানো ? এই গঙ্গামাই !' এই বলে একটু দম নিলেন রত্নাকর। তারপর খুব ভারী গলায় বললেন : 'এখন এ পাথর কাকে দেব বলো তো ! তোমাদের দেব ?—নাকি বাদশাহকে ভেট দেব ! নাকি গঙ্গামাইকে ফিরিয়ে দেব ?'

সিপাহিরা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নাটকীয়ভাবে বজরা থেকে রত্নাকর লাফ মারলেন গঙ্গার জলে। হাতের মুঠোতে সেই পরশপাথর।

বর্ষার জলে টলমল করছে নদী। রত্নাকর কোথায় যে তলিয়ে গেলেন, তা কেউই ঠাহর করতে পারল না। ফৌজদার আর সিপাহিরা শুকনো মুখে ফিরে গেল আগ্রায়।

কিংবদন্তির পাথর পৌঁছে গেল কিংবদন্তির দেশে।

ছবি : অনুপ রায়

শোওয়া-পণ্ডিতের গল্প

কমলেন্দু চক্রবর্তী

"ছোটমামা, একটা গল্প বলো।"

"বেশ। কিন্তু কিসের গল্প বলব?"

"একটা পণ্ডিতের গল্প। গল্পে দুঃখ-টুঃখ কিচ্ছু থাকবে না কিন্তু, শুধু মজা থাকবে।"

"তবে শোনো। এক ছিলেন পণ্ডিত। মস্ত বড় পণ্ডিত। সারাদিন টোল নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।"

"টোল কী ছোটমামা?"

"টোল হল ইস্কুল। তখনকার দিনে ইস্কুলকে বলত টোল। টোলে ছাত্রদের পড়াশুনো শেখাতেই পণ্ডিতের সারাদিন কেটে যায়। আর সন্ধেবেলা হাজির হন রাজসভায়।"

"রাজসভায় কী করতেন পণ্ডিত?"

"রাজসভায় পণ্ডিত রাজাকে কত শাস্ত্র-কথা শোনাতেন। শাস্ত্র নিয়ে রাজসভায় কত আলোচনা হত। তাছাড়া পণ্ডিতকে নানা দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে বসতে হত মাঝে-মাঝেই।

"পণ্ডিতের একটা ছেলে ছিল। খুব দুষ্টু ছেলে। পড়াশুনোয় একদম মন নেই। পণ্ডিত তাকে নিজের টোলে পড়াবার অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে ছেলে টোলে যাবেই না।"

"কেন?"

"পণ্ডিতের ছেলে হয়ে ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে এক টোলে পড়বে না। ছেলে জেদ ধরল, যদি পণ্ডিত তাকে বাড়িতে বসে পড়ান তবেই সে পড়বে, না হলে নয়। এদিকে পণ্ডিতেরও তো সময় নেই। দিন-রাতই তিনি ব্যস্ত। দিনে টোলে আর রাত্রে রাজসভায়। নিজে পণ্ডিত অথচ ছেলে মূর্খ হবে—তাই বা কী করে সহ্য করেন? শেষে পণ্ডিতমশাই স্থির করলেন রাজসভা থেকে ফিরে রাত্রে বিশ্রাম নেবার

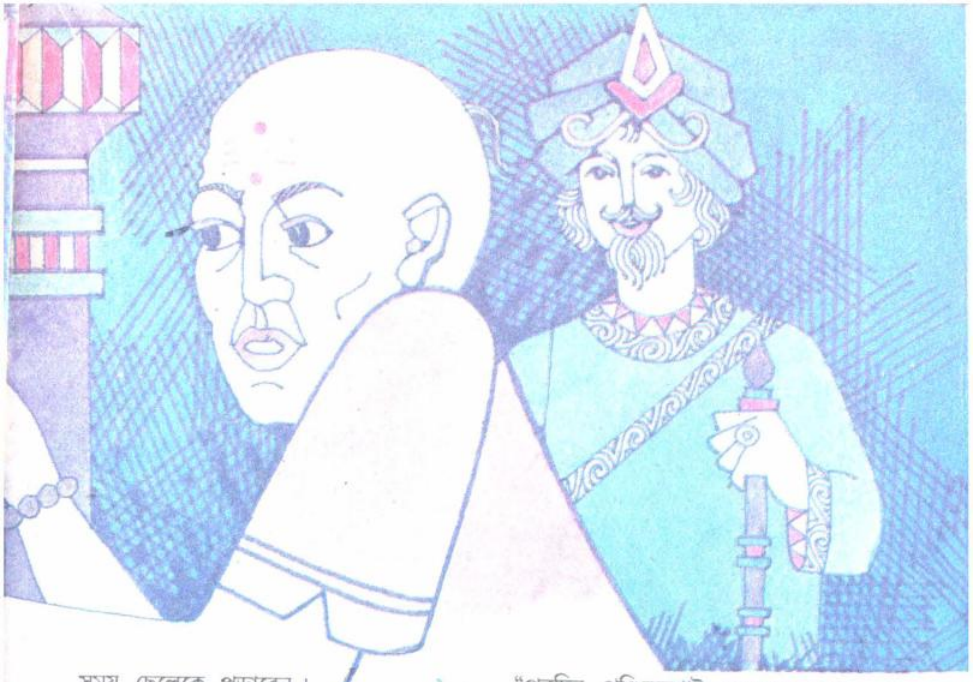

সময় ছেলেকে পড়াবেন।

"হলও তাই। প্রতিদিন রাত্রে পণ্ডিত বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ছেলেকে শেখাতে লাগলেন শাস্ত্রকথা। পণ্ডিতের ছেলেও পণ্ডিতের পাশে শুয়ে-শুয়েই শিখতে লাগল নানা শাস্ত্র। এইভাবে শিখতে-শিখতে সে-ও একদিন পণ্ডিত হয়ে গেল।"

"শুয়ে-শুয়ে শিখেই পণ্ডিত হয়ে গেল পণ্ডিতের ছেলে? বেশ মজা তো!"

"ওদিকে একদিন রাজামশাই সেই পণ্ডিতকে বললেন, পণ্ডিত মশাই, আগামীকাল ভিনদেশের এক পণ্ডিত আসছেন আপনার সঙ্গে তর্ক করতে। পণ্ডিতমশাই সবিনয়ে বললেন, মহারাজ, আমার তো অনেক বয়স হল। এখন আমি আর কী তর্ক করব! অনেক তো করেছি। আমার ছেলেকে তো সব শিখিয়ে দিয়েছি। ও-ই এখন তর্ক করুক। রাজা রাজি হলেন।

"পরদিন পণ্ডিতমশাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় হাজির হলেন। ভিনদেশী পণ্ডিতও এসেছেন। সিংহাসনে বসলেন রাজামশাই। তাঁর সামনে দুই পণ্ডিত বসলেন মুখোমুখি। শ্রোতারা যে যার আসন গ্রহণ করলেন। শুরু হল তর্ক। প্রথমে ভিনদেশী পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে তর্ক শুরু করলেন, শাস্ত্রের নানা দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন তিনি কত জ্ঞানী। এবার পণ্ডিতমশায়ের ছেলের পালা।

"পণ্ডিতের ছেলে উঠে দাঁড়াতেই শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু এ কী! পণ্ডিতের ছেলে যে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। কোনো কথাই বলছে না। তবে কি ও হার স্বীকার করে নিল? রাজামশায়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠল রাগে।

"ওদিকে পণ্ডিতমশাই তো সভায় বসে সবই দেখছেন। এত করে যে ছেলেকে সব শাস্ত্র উজাড় করে শেখালেন, সে কিনা

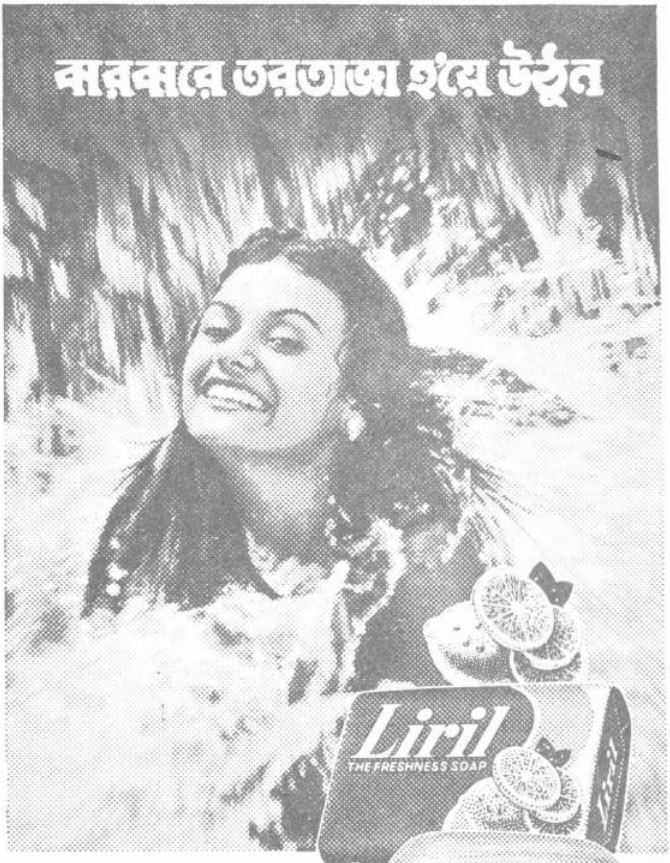

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ তরঙ্গ — লেবুর চনমনে
সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে
হ'তে লিরিল ··· স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস - LR.27.1810
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

এখন সব বেমালুম ভুলেই গেল ! ছেলের পরাজয় মানে তো তাঁরই পরাজয়। পণ্ডিতমশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সজোরে এক চড় মারলেন ছেলের গালে। ছেলের উচিত শিক্ষা হোক ! চড়টা এত জোরে মেরেছিলেন যে সেই চড়ের ঘায়েই তাঁর ছেলে ধড়াস করে মেঝেতে পড়ে গেল। আর মেঝেতে পড়তেই পণ্ডিতের ছেলের মুখ দিয়ে অনর্গল জ্ঞান-গর্ভ সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল ফুলঝুরির মতো। কী জ্ঞান পণ্ডিতের ছেলের ! ভিনদেশী পণ্ডিতের ব্যাখ্যার কত ত্রুটি দেখিয়ে দিল। সবাই তো অবাক পণ্ডিতের ছেলের জ্ঞানের বহর দেখে। অগত্যা হার স্বীকার করে পালাবার পথ পেলেন না সেই ভিনদেশী পণ্ডিত। সভাসুদ্ধ সবাই এবার পণ্ডিতের ছেলের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

"পরে রাজামশাই সেই পণ্ডিতমশাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বলুন তো ? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপনার ছেলে কিচ্ছু বলতে পারল না, অথচ মেঝেতে শুয়ে-শুয়ে তো দিব্যি জ্ঞানের কথা বলে গেল।

"পণ্ডিতমশাই বললেন, আমারই দোষ রাজামশাই। শুয়ে-শুয়েই তো ও সব শিখেছে আমার কাছে। তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর শাস্ত্রকথা মনে পড়েনি। চড়ের ঘায়ে মেঝেতে শুয়ে পড়তেই সবকিছু ওর মনে পড়ে গিয়েছিল।"

"তারপর কী হল ছোটমামা ?"

"তারপর পণ্ডিতের ছেলেই মস্ত বড় পণ্ডিত হয়ে উঠল। দেশ-বিদেশের বড়-বড় পণ্ডিতরা তার কাছে তর্কে হেরে যেতে লাগল। শুয়ে-শুয়ে তর্ক করত বলে পণ্ডিতের ছেলে 'শোওয়া-পণ্ডিত' নামেই পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠল।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

প্রশ্ন ও উত্তর

পবিত্র সরকার

বাপ রে ও কী ? রাস্তাতে কি
তিনশো কুকুর কাঁদছে ?
কিংবা অনেক ধোপার গাধার
কোরাস গলা সাধছে ?
সাইরেনের ও শব্দ নাকি ?
পারছে না আর থামতে ?
বাঘ জুড়েছে হালুম-হুলুম
শহরতলির প্রান্তে ?
বোমাবাজির কারখানা কি
আগুন লেগে ফুটছে ?
ভূমিকম্পের আওয়াজ ও কি
ভুঁই ফুঁড়ে ঐ উঠছে ?
নাকি বাড়ির ছাদের ওপর
চালাচ্ছে কেউ ট্রাকটার ?"

"ধুত কী বলিস, ও কিচ্ছু নয়,
মিথ্যে তোরা করিসনে ভয়,
ঘুমোচ্ছেন ঐ মেসোমশায়
উঠছে নাকের ডাক তাঁর।
জলদাপাড়ার বনে তিনি
পশুপাখির ডাক্তার।
পেটখানা তাঁর মস্ত বড়,
মাথায় বিশাল টাক তাঁর।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ফ্ল্যাশ গর্ডন

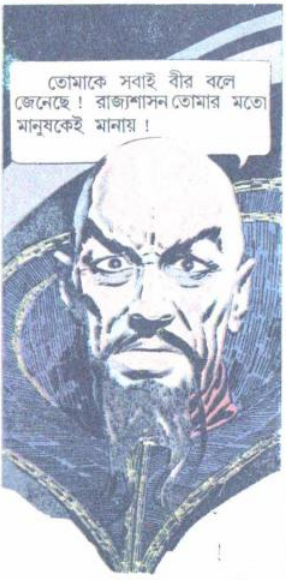

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর

সন্তোষকুমার দে

এ-বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে দুজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে একজন ভারতীয়—ডঃ সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর। ৭৩তম জন্মদিনে তিনি এই সুসংবাদটি পান। তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত চারজন ভারতীয় এই আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন।

ডঃ সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর স্যার সি ভি·রমনের নিকট-আত্মীয়। একই পরিবারে দুইজনের নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ের বিরল দৃষ্টান্ত একমাত্র মাদাম কুরি ও তাঁর স্বামীর ক্ষেত্রেই ইতিপূর্বে ঘটেছে।

ডঃ চন্দ্রশেখর ১৯১১ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের লাহোর শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হবার পর তিনি ইংলণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ইংলণ্ড যাওয়ার পথে জাহাজে বসেই তিনি পদার্থবিদ্যার যে তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন পরে তাই ১৯৩১ সালে কেমব্রিজ প্রমাণিত করে জগদ্‌বিখ্যাত হন। তাঁর আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ৫২ বছর পরে এলেও বিজ্ঞানজগতে তিনি 'চন্দ্র' নামে আগেই সুপরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর তত্ত্বের নাম—চন্দ্রশেখরের সীমা (Chandrasekhar's limit)।

১৯৩৬ সালে তিনি আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উইসকনসিনের উইলিয়ম বে-তে অবস্থিত ইয়ারকেশ অবজারভেটরিতে গবেষণা করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, এই অবজারভেটরিতেই পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবিনটি আছে যাতে আলোক-প্রতিফলন পদ্ধতিতে কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রও দেখা যায়। চন্দ্রশেখরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ ফিলিপ মরিসন বলেছেন, "অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অতুলনীয় চিন্তার উপরেই গড়ে উঠেছে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, যার ফলে অতিদূরের তারকামণ্ডলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছে।"

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম অধ্যাপক, তাঁর সহকর্মী ডঃ জন সিম্পসন বলেছেন, "যখন আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নিযুক্ত হই তখন যে দুজন অধ্যাপক আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ এনরিকো ফারনি (১৯৩৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান), আর ডঃ চন্দ্রশেখর। ডঃ 'চন্দ্র' প্রকৃতপক্ষে আমার শিক্ষাগুরু। সত্যিকারের বিজ্ঞান কাকে বলে তা আমি

একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহারে থাকা উচিৎ সব কটি পুষ্টিকর উপাদান ঠিক ঠিক পরিমাণে...

সেরেল্যাক
একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার —যা অত্যন্ত সুস্বাদু

যখন আপনার বাচ্চার বয়েস প্রায় চার মাস আর সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।

অর্থাৎ, শক্ত আহারের মাধ্যমে বাচ্চার যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান, প্রোটীন ও ক্যালোরী পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্যে আপনাকে আর অন্য কোনও খাবার দিতে হবেনা।

পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, মালাইদার দুধ ও চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ।

সেরেল্যাকে আছে শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটীন, প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট আর সুস্থ-সবল বেড়ে উঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাকে সেরেল্যাক দিন!

সেরেল্যাক®
এতে দুধ মেশানো আছে

সেরেল্যাক তৈরী করে খেতেও কি সোজা! শুধুমাত্র আগে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে নিন, বাচ্চুন আর খেতে দিন!

SAA FSL/C/2670 BEN

NESTLÉ

তাঁর কাছেই শিখেছি।"

আর ডঃ উইলিয়ম ফাউলার—যিনি ডঃ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে একযোগে এবারের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি চন্দ্রশেখরকে তাঁর 'আদর্শ' বলে উল্লেখ করেছেন।

'চন্দ্রশেখরের সীমা' তত্ত্বটি বোঝা এবং বোঝানো সহজ নয়। আকাশে আমরা যেসব নক্ষত্র দেখি তার সবগুলি সমানবয়সী নয়, অনেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। নক্ষত্রের ঘনত্ব যত বাড়ে তত তার মাধ্যাকর্ষণ-টান বাড়ে। ফলে তার তেজবিকিরণও বাড়ে, আর তাতেই প্রদীপের তেল ফুরোবার মতো তার আয়ুও ফুরিয়ে আসে। আকারে খাটো হয়ে দেহের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া নক্ষত্রকে বলে হোয়াইট ডোয়ার্ফ। একটি নক্ষত্রের দেহের ঘনত্ব কতটা হলে তার তেজস্ক্রিয় পদার্থ সত্বর ফুরিয়ে যেতে থাকে তাই হিসাব করে চন্দ্রশেখর দেখিয়েছেন, যেসব নক্ষত্রের দেহের ঘনত্ব আমাদের সূর্যের দেহের ঘনত্বের ১·৪ ভাগ বেশি হয় তাদেরই হোয়াইট ডোয়ার্ফ হবার অবস্থা ঘটে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্লাক-হোল্ তত্ত্বটিও এই আবিষ্কারের উপর গড়ে উঠেছে।

ডঃ চন্দ্রশেখর আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে, নিরভিমান এবং আত্মপ্রচারবিমুখ। বিজ্ঞান ছাড়া উচ্চাঙ্গসঙ্গীত এবং সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ আছে। শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর প্রিয় লেখক। বিঠোভেন তাঁর প্রিয় সুরকার, আর আইনস্টাইন তাঁর প্রিয় বৈজ্ঞানিক। সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় তিনি এই তিন বিরল প্রতিভার সৃজনশীলতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

বেচা-কেনা

অশোক রায়চৌধুরী

বেচারাম সুর আর
কেনারাম শূর
দুই জনে বেচে কেনে
মুড়ি আর গুড়।
কেনারাম কেনে আর
বেচারাম বেচে
সাতে-পাঁচে নেই তারা
নেই ঘোরপ্যাঁচে।
কেনারাম মাখে আর
বেচারাম খায়
দুইজনে মিলে-মিশে
সুখে দিন যায়।
সেই সুখ সইল না
তাদের কপালে
বেচাকেনা ছেড়ে, যেতে
হল পাঠশালে।
লেখাপড়া শিখে তারা
হয়ে গেল পণ্ডিত,
তার মানে হরিহর
হল যে দ্বিখণ্ডিত্।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রিয়া...

...সতেজ সুন্দর অনুভূতি!

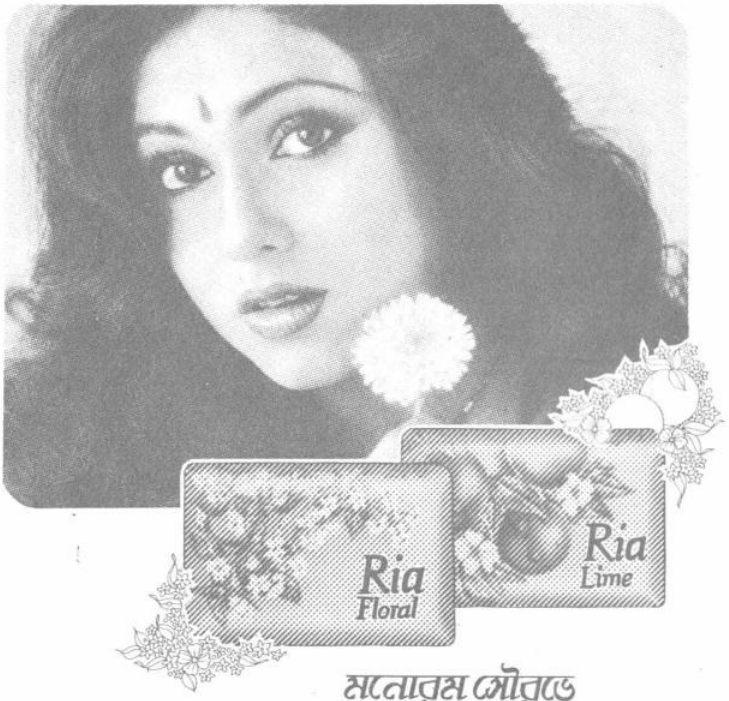

মনোরম সৌরভে
ফুল রিয়া
আর লেবু রিয়া

ফুল রিয়া	লেবু রিয়া
কোমল ও মৃদু!	শীতল ও তরতাজা
সৌখিন গোলাপী	করা! চন্‌মনে
সাবান ফুলের হাল্‌কা	সবুজ সাবান লেবুর
সৌরভে!	লোভনীয় সৌরভে!

টাটার তৈরী **রিয়া সুরভিত সাবান**

CASTR.8-172 BEN

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ৯ ॥

ঠিক সাত বছর আগে ১৯৪৮-৪৯ মরসুমে জোহান্সবার্গের এলিস পার্কে ইংল্যাণ্ডের দুই খ্যাতকীর্তি ব্যাটসম্যান লেনার্ড হাটন ও সিরিল ওয়াশব্রুকের প্রথম উইকেটের জুটি বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁরা ৩১০ মিনিটে ৩৫৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। হাটনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল ১৫৮ এবং ওয়াশব্রুকের ১৯৫। টসে জিতে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক এফ জি ম্যান ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন। দলের গোড়াপত্তন করতে নেমে, প্রথমদিনে ৩১০ মিনিটে ৩৫৯ রান তুলে হাটন এবং ওয়াশব্রুক প্রমাণ করেছিলেন—ক্যাপ্টেন যথার্থ সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। সেই ঐতিহাসিক খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আর একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন ডেনিস কম্পটন। চোখ-ধাঁধানো সেঞ্চুরি।

ড্রেসিংরুমে বসে আমার মতো ভিনু মাঁকড়ও শিহরিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকরা যতক্ষণ ছিলেন, আমাদের দুজনের কেউই বিশেষ কথাবার্তা বললাম না। ওঁরা চলে যাওয়ার পরে ভিনুভাই আমার দিকে তাকালেন। মুখে কোনো কথা নেই। তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি মাঁকড় কী বলতে চাইছেন। একটামাত্র প্রশ্নই তাঁর চোখের ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। হবে তো? আমি কী জবাব দেব! ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা কেউ কোনোদিন বলতে পেরেছে? আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লাম।

"আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাব।"

"আলবত।" ভিনুভাই চেয়ারের হাতলে একটা চাপড় মেরে মাঠে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। "ওয়ার্ল্ড-রেকর্ডের এত কাছে এসে ফশকে যাওয়া চলবে না। উই শুড স্টে। এবং আজ আমরা বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেবই।"

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি তখন একটু স্নায়ুর চাপের মধ্যে ছিলাম। মন বলছে, আমাদের জুটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ফেলুক। রেকর্ড-বইতে হাটন-ওয়াশব্রুকের নাম মুছে যাক। পঙ্কজ রায়-মাঁকড়ের নাম লেখা হোক, নতুন কৃতিত্বের সুবাদে। আবার এও ভাবছি, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। প্রতিটি মুহূর্ত রহস্যের ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। কী যে হবে কেউ জানে না। যদি আমাদের কেউ ৩৫৯ রানের আগে আউট হয়ে যাই, তবে কারোরই আক্ষেপের সীমা থাকবে না। মনে মনে আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, তীরে এসে যেন তরী না ডোবে। হে ভগবান, ৩৫৯ রানের হার্ডলটা যেন ঠিকমতো পেরিয়ে যেতে পারি।

ক্রিজে পৌঁছবার পরে ভিনুভাই আর আমি ছোট একটা 'মিড-উইকেট কনফারেন্স' সেরে নিলাম। ঠিক হল, মারধর না করে এখন আমরা বিশ্বরেকর্ড

একটুখানি ন্যাট'এর ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়

ন্যাট সত্যিই বাজারের অন্যতম সেরা ডিটারজেন্ট পাউডার। সোডা অ্যাশে ভরা সস্তা পাউডারের থেকে ন্যাট যে ঢের বেশী ভাল তা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। জামাকাপড় সহজে চমৎকার পরিষ্কার হয়। ন্যাটের দানাগুলো হালকা ব'লে এর ১ কেজি প্যাকেট সস্তা পাউডারের দু প্যাকেটের চেয়েও বেশী। তাই পরিমাণে লাগেও কম, চলেও অনেক দিন। ফলে খরচ বাঁচে অনেক।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

রঙও হাসে, কাপড়ও বাঁচে সাদা হয় আরও সাদা

A Kusum Product

C83.142B

ভাঙার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকব। তারপর, আমাদের ইচ্ছাপূরণ হয়ে গেলে, ফের না হয় মুণ্ডপাত করা যাবে নিউজিল্যাণ্ডের বোলিংয়ের। আপাতত, নো ছটফটানি। ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে, কেবল হাটন-ওয়াশব্রুকের তৈরি গাঁট পেরিয়ে যাওয়া। অতএব আমরা ধীরেসুস্থে খেলতে লাগলাম। কিছু পরে মাঁকড়ের স্ট্রোকে দু রান নিয়ে পেরিয়ে গেলাম ৩৫৯ রানের বেড়া।

কর্পোরেশন স্টেডিয়ামের উদ্বেলিত জনতার হাততালি আর থামতেই চায় না। আনন্দে তাঁদের হৃদয় আপ্লুত। পতাকা নাড়া, জামা ওড়ানো, উদ্দাম নৃত্য—গ্যালারিতে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। কেউ কোনো কথা শুনছে না। চেঁচামেচির একশেষ। নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপনের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানালেন নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক কেভ। বিরাট গ্লাভস দিয়ে ভিনুভাই এবং আমার পিঠে অভিনন্দনের চাপড় মারলেন উইকেটরক্ষক ম্যাকমাহোন। 'ওয়েল ডান'।

অভিনন্দনের পালা, হাততালির ঝড় মিটে যেতে আমরা আবার অবাধ ব্যাটিং শুরু করলাম। একসময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল স্কোরবোর্ডের দিকে। আমি তখন উলটো দিকের ক্রিজে দাঁড়িয়ে, ব্যাট করছেন ভিনু মাঁকড়। আরে, এ কী! ভিনুভাই যে ডাবল সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। আর আমার স্কোর একশো ষাট। মাঁকড়ের মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল, জানি না। কিন্তু আমার বুকটা ঢিপঢিপ করছিল, একথা সত্যি। টেস্ট-জীবনে ডাবল সেঞ্চুরি করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলেই হয়তো।

স্থির করলাম, এই সুবর্ণসুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডবল সেঞ্চুরি করার মর্যাদাই আলাদা। ক'জনের কপালে এমন সম্মান জোটে? দুশো রান করা তো আর চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। সেঞ্চুরি করতেই কালঘাম ছুটে যায়, ডাবল সেঞ্চুরি করা কী কষ্টকর তা তো বুঝতেই পারো। সুতরাং একবার যখন দুর্লভ সৌভাগ্যের কাছাকাছি এসে গেছি, তখন দুশো রান করার প্রাণপণ চেষ্টা করব। জীবনে আর কখনও এমন সুযোগ আসবে কি না কে জানে। সামান্য সাবধান হয়ে খেললে আমি ডাবল সেঞ্চুরিটা পেয়ে যেতে পারি। শুধু দরকার একটু সংযম, একটু ধৈর্য। নিজেকে সেভাবে বুঝিয়ে তৈরি হলাম।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। বিধির বিধানের বাইরে যায় এমন সাধ্য কার? জানো, অনেক আগে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম না। কেউ কোনো বিষয়ে নিয়তি বা ভাগ্যের দোহাই দিলে হেসে উড়িয়ে দিতাম। পরে সহস্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে অনুভব করেছি, না, ওগুলো গালগল্প নয়। এখন যে গল্পটা তোমাদের বলে চলেছি সে ঘটনাটা তারই একটা উদাহরণ।

ওভারের শেষে ভিনুভাইকে ডেকে বললাম, "তোমার রান কত হয়েছে দেখেছ?" ভিনু নির্লিপ্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি। দুশোর খুব কাছাকাছি এসে গেছি আমি। তুমিও তো অনেকখানি এগিয়ে এসেছ।" পিচের ওপর ব্যাট ঠুকছিলেন মাঁকড়। "শোনো, আমার ডাবল সেঞ্চুরিটা হয়ে গেলে তুমি তোমার দুশো কমপ্লিট করে নাও। ভারতের দুজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড করেছে সে একটা দারুণ ব্যাপার হবে। সামথিং ফ্যান্টাস্টিক। নাউ, ফর হেভেনস্ সেক ডোন্ট লুজ ইওর পেশেন্স।" (ক্রমশ)

নট-আউট

সুইঙ আর কাটার-এর জারিজুরি ফক্কা
গুগ্‌লী বা টপ্‌ স্পিন, সবেতেই ছক্কা!
হুক, পুল, লেট-কাট, মার সব চোস্ত
বোলারেরা কাঁদ-কাঁদ, ফিল্ডার ত্রস্ত
এই ছোটে থার্ড ম্যানে, এই ছোটে কভারে
গেল! গেল! ধর! ধর! ফের চার, বাবারে!
রান বাড়ে যত তার রোদ বাড়ে দশগুণ
মাথা করে ঝিমঝিম, ঘেমে নেয়ে হয় খুন।
সন্ধ্যায় ফেরে সব চেহারা কি অপরূপ!
রোদে পোড়া ঝলসানো, জামা ভিজে চুপচুপ।
নট আউট যে ব্যাট্‌সম্যান হাসিখুশি মূর্তি
সেঞ্চুরী হাঁকড়িয়ে প্রাণভরা ফূর্তি।
একগাল হেসে বলে, এই নিন বোরোলীন
ভাল করে হাতে মুখে এক্ষুনি মেখে নিন।
রোদ-জ্বালা, কাটা-ছড়া সেরে যাবে চটপট।
ফিল্ডিং-এ নামবেন, কাল ফের ঝটপট।

কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

GD

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-5242A

নোটোর দল

লীলা মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : ল্যাংড়া জানোয়ারদের নিয়ে নোটোর দল চিড়িয়াখানা বানিয়েছিল। কিন্তু গোরু-বাছুর রাখার জন্য একদিন সে-ঘর খালি করতে হল। 'দুঃস্থ' পশুরা যায় কোথায় ? পরিবন নাকি ভয়ংকর জায়গা। পরিরা নাকি নোটোদের মা-বাবাদের হরিণ করে দিয়েছে। নোটো বলে, ওসব বানানো গল্প। রবিবারে মেলা দেখার নাম করে ওরা বেরিয়ে পড়ে। মেলায় এক ওঝা অদ্ভুত গান শুনিয়ে নোটোর হাতে 'জ্ঞানের ওষুধ' দেয়। দুঃস্থদের নিয়ে ওরা পরিবনে ঢোকে। সেখানে অন্য গাছ, অন্য জন্তু, অদ্ভুত ফল, অদ্ভুত পাথর। নৌকোয় কুমিরজলা পার হয়ে ওরা পরিদ্বীপে যায়। সেখানে বাতাসে গা-শিউরানো বাঁশির সুর। নোটো সবাইকে অভয় দেয়, পাথরের ফুটোয় বাতাস ঢুকে অমন শব্দ হচ্ছে। দ্বীপের নিঝুম পরিবেশে ছোটরা ভয় পায়। বলে, এখানে কোথায় মা-বাবাদের খুঁজে পাব ? চলো ফিরে যাই। নোটো বলে, এবার তোদের আসল কথা বলার সময় হয়েছে। তারপর···

॥ ৭ ॥

মৌ বলল, 'মন দিয়ে শুনব কী করে ? ন্যাড়া আমার গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।' 'ন্যাড়া ঘুমোক। তোরা শোন্।' তারপর নোটো এক অদ্ভুত গল্প বলল।

নোটো বলল, 'দাদু বলেছিল, পাঁচ বছর আগে এদিকে লড়াই হয়েছিল। সীমান্তর ওপার থেকে বহু বিদেশী লোক এদেশে ঢুকে গোরু ছাগল ঘোড়া এ-সব তো নিয়েই যাচ্ছিল, তার ওপর ফসল নষ্ট করে দিচ্ছিল। অনেক লোককেও মেরে ফেলেছিল। সীমান্ত কী জানিস তো ? সীমান্ত হল যেখানে আমাদের দেশ শেষ হয়ে গিয়ে, বিদেশীদের দেশ শুরু হয়ে যায়। শেষটা গোলাগুলি চলতে লাগল। কত লোক প্রাণ হারাল। বোমার বাবা তাদের একজন।

'তোরা তো জানিস আমাদের বাপ-ঠাকুরদার সময় থেকে পুরুষরা হয় পল্টনে যায়, নয় বনরক্ষীর কাজ করে। আমাদের এই পরি-বন, জগৎ-জলা—এ সব জায়গা সীমান্ত থেকে খুব দূরে নয়। এ জায়গা খুব ভাল ছিল না। লোকে বলত জেলেদের অর্ধেক ডাকাতি করে, বাকিরা শত্রুদের চর। তাই এখানে পল্টনের ঘাঁটি করা ঠিক হল। দুটো মোটরবোটে করে জলার ওপর দিয়ে কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে আগে পাঠানো হল। তাদের মধ্যে দাদু-নানির দুই ছেলে ছিল।'

এই অবধি শুনে মৌ লটকান কেঁদে উঠল, 'মরে গেছে ! তবে কি তারা সবাই মরে গেছে ?' নিমাই বলল, 'আহা, শেষ অবধি শোন্ তো। কেউ মরেনি। তাদের আমরা খুঁজে বের করব। বলো নোটোদা, তারপর কী হল ?'

'তাদের সঙ্গে একটা লোহার বাক্সে অনেক টাকাকড়ি আর দলিলপত্র ছিল। দলিলপত্রে সন্দেহজনক লোকদের নাম-ঠিকানা ছিল। সে দুটো মোটরবোটের কিম্বা টাকাকড়ি দলিলপত্রের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু দাদুর দুই ছেলে, আর তাদের সঙ্গে আরো তিনজন ছিল, এদের পাঁচজনকে জলার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছিল। সকলে তাদেরই সন্দেহ করেছিল। বলেছিল ডাকাতদের সঙ্গে নিশ্চয় তাদের ষড় ছিল। তারা কিছুই বলতে পারেনি। মোটরবোটের চালকরা

নাকি পান খেতে দিয়েছিল, তারপর আর কিছু মনে নেই। কোনো প্রমাণ ছিল না ; কিন্তু অতি ভাল সৎ লোক সবাই। তাই কারো শাস্তি হল না, কিন্তু সকলের পল্টনের চাকরি গেল।' নোটো থামল। নিমাই বলল, 'ঐখানেই শেষ নয়। আরো বল।'

'তারাও যে-সে ছেলে ছিল না। প্রতিজ্ঞা করল ঐ চুরিকরা বাক্স খুঁজে বের করবে, তবে তারা ঘরে ফিরবে। চলে গেল সবাই। দাদুর ছোট ছেলেও কয়েক দিন পরে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে আমাদের মা-রাও চলে গেল, নইলে কে তাদের দেখাশুনো করবে, ভাত রেঁধে দেবে। তারপর ৫ বছর কেটে গেছে। সে বাক্সও পাওয়া যায়নি, তারাও ফেরেনি। কোথায় আছে কেউ জানে না। তবে আমার বিশ্বাস বোমা কিছু কিছু জানে। ওর বাবাও ওদের দলেই একসময় ছিল।

'এখন বুঝতে পারছিস আমাদের কী করতে হবে ? ঐ বাক্স খুঁজে বের করতে হবে।'

মৌ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ডাকাতরা নিয়ে পালিয়েছে। সে কি এতদিন আছে !'

'না, পালাতে পারেনি। বাক্স কোথাও লুকিয়ে রেখে, তারা সে রাতের মতো জেলে-পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। জেলেদের সঙ্গে ভীষণ মারামারিও হয়েছিল। তারপর কী করে যে আগুন ধরে গেছিল কেউ জানে না। কেউ বাঁচেনি।'

লটকান চমকে উঠল, 'কেউ বাঁচেনি ? ছোট বাচ্চারা, তাদের মা-রাও না ?'

নোটো বলল, 'ও গ্রামে কেউ পরিবার নিয়ে থাকত না। সব চেঁছেপুঁছে সাফ হয়ে গেল। বাবা-মারাও আর ফিরল না। এখন সেই বাক্সটা খুঁজে বের করে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে।'

অমনি সবাই লাফিয়ে উঠল, 'তবে বসে আছি কেন ? চলো, চলো, চলো ! খবরের কাগজে দেখলে তবে মা-বাবারা ফিরবে !!'

নিমাই তবু জিজ্ঞাসা করল, 'পাঁচ বছর হয়ে গেল ! এর মধ্যে কেন বন জঙ্গল, বড় বন, ছোট বন, জগৎ-জলার পাড়, খুঁজে তোলপাড় করা হয়নি ?' 'হয়েছে, হয়েছে। দাদু নিজে লোকজন নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছে। একা নৌকো বেয়ে এই পরিদ্বীপ দেখে গেছে। কোথাও কিছু নেই। খালি অদ্ভুত আলো দেখেছে, পরিদের বাঁশি শুনেছে। রাত কাটাবার সাহস হয়নি। দিনে দিনে দ্বীপটাকে গোরু-খোঁজা করে ফিরে গিয়েছে।'

'তবে আবার আমরা এলাম কেন, নোটোদা ?'

'এখানেই কোথাও আছে নিশ্চয়। সরাবার তারা সময় পেল কখন ? সেই রাতেই যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছিল। ওঠ, বিকেল হয়ে গেছে। দাঁড়কাগটা কার কে জানে। ছোটবেলায় একটা পোষা দাঁড়কাগ দেখেছিলাম। কোথায় মনে পড়ে না। সব কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া। মা-বাবার মুখও মনে নেই।'

মা-বাবার মুখ কারো মনে নেই। ন্যাড়ার তখন দু-মাস বয়স ছিল। ও নানিকেই মা বলে। সকলের মন ভারী হয়ে উঠেছিল। পরি-দ্বীপের কচ্ছপ-টিলার প্রতিটি ঝোপেঝাড়ে, গুহায়-গর্তে ওরা খুঁজে দেখল। কোনো জায়গায় জমি ফোঁপরা। মাটির নীচে বহুকাল ধরে খরগোশরা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। প্রতি বছর টিলার নীচে জলার ধারে ফাঁদ পেতে, জগৎ-জলার অন্য পারের জেলেরা হাজার হাজার খরগোশ ধরে, বাজারে গঞ্জে বেচে, মাছের ব্যবসার চেয়ে বরং বেশি আয় করেছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা দ্বীপটাকে বেড় দিয়ে আবার দক্ষিণদিকে পৌঁছল। এখান থেকে অনেক দূরে তীরের রেখা দেখা যায়। এই দিক থেকেই ওরা এসেছে। এখানে এক জায়গায় পাথরগুলো উঁচু হয়ে দেয়ালের মতো হয়ে আছে। সেখানে অজস্র

কোকর। তাতে পাখির বাসা। বাসায় কত ডিম। যেই না ঐ দিক থেকে বাতাস বইল, কানের কাছে শাঁখের মতো বেজে উঠল। একেই দূর থেকে সব পরির বাঁশি মনে করে ভয় পায়।

হেঁটে হেঁটে, ঝোপেঝাড়ে, খানায়-গুহায় উবু হয়ে খুঁজে খুঁজে পা যখন আর চলে না, তখন আলো কমে এসেছিল। একটু বিশ্রাম না করলে হবে না। খরগোশরা যে যার বাসা নিচ্ছিল। হরিণরা খোলা জায়গা পছন্দ করে না। মনের সব উৎসাহ চলে গেছিল ওদের। না-খোঁজা জায়গা বাকি নেই। ব্যথা পা মেলে দিয়ে, মৌ বলল, 'পরি নেই আর বোলো না। তারাই বাক্সটাকে নেই করে দিয়েছে। নয়তো জলে ফেলে দিয়েছে।'

নোটো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'সে ভয় আমারও যথেষ্ট আছে। পরিরা নয়। পরি-টরি হয় না। কিন্তু ডাকাতরাই শেষ মুহূর্তে যখন দেখল জেলেরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন বাক্সটা জলে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। তাহলে আর পাওয়া যাবে না। ডাঙা থেকে একটু দূরেই গভীর জল। সব জলেরই তল আছে। অতল জল হয় না। তবে সেখান থেকে তোলা যাবে না। ডুবুরি নামিয়ে তুললেও কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।—যাক্‌গে, ভেবে লাভ নেই। ওঠ্, রাতের আস্তানা করতে হবে। খুব হিম পড়ে। ঐ বাঁশঝাড় থেকে শুকনো বাঁশ নিয়ে, মশাল বানাতে শিখেছি আমরা। আয় নিমাই।'

এই বলে থলি থেকে সেই বড় ছুরিটা নিয়ে নোটো দৌড়ল। একটু অসাবধান হয়ে গিয়ে থাকবে। বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হাঁটু অবধি মাটিতে বসে গেল। খরগোশদের পুরনো বাসা। নিমাইয়ের

সাহায্যে ঠ্যাংটাকে টেনে বের করল বটে নোটো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঃ বলে বসে পড়ল। পা-টা বোধহয় মচকেই গেল। ফালা করে গামছা ছিঁড়ে টাইট করে বেঁধে দিল মৌ। কিন্তু হাঁটা মুশকিল। ও পায়ে ভর দেওয়া যাচ্ছিল না। নোটো নিমাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল।

সবাই মিলে দুটি ছোট মশাল তৈরি করে, তার আগায় শুকনো পাতা জড়িয়ে নিল। ততক্ষণে গাছের ছায়া লম্বা হয়েছে, সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। ঝোলাঝুলি ঝেড়ে যা খাবার-দাবার ছিল সব সাবাড় করা হল। কলা ছিল, পেয়ারা ছিল। খাবার কিছু বেশি ছিল না। কাল সকালের জন্যেও কিছু রইল না। ঝরনার জল খেল সবাই। বাঁশের চোঙে করে নোটোর জন্যেও নিয়ে আসা হল। ওদের গ্রামে সবাই বাঁশের চোঙে তেল-টেল রাখে। বেশ জলও খাওয়া যায়।

লটকানের কোলে মাথা রেখে ন্যাড়া শুয়ে পড়ল। নিমাই আর মৌ রাত কাটাবার জন্য একটা শুকনো গুহা, কি গাছের বড় কোটরের খোঁজে বেরুল। খুব বড় গাছ বেশি ছিল না পরিধীপে। তবে একেবারেই যে ছিল না, তা-ও নয়। সেটা একটু দূরে। খুঁজে পেতে খানিকটা সময় নষ্ট হল।

পাথরের ঢিবি দেখে গুহার সন্ধানে সেদিকে এগোতেই, একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেল ওরা। কালো পাথরের কোল ঘেঁষে মাটি থেকে বগবগ করে জল বেরুচ্ছে। সেই জলই নালার মতো বয়ে গিয়ে ওদের ঝরনাটি হয়েছে। কিন্তু ছোটখাটো গুহা পেলেও মানুষ থাকবার মতো একটিও নয়। ক্রমে ওরা হতাশ হয়ে উঠেছিল। রাত কাটাবে কী ভাবে? নোটোর পা তো বাঁধা হলেও ফুলে গেছে। তাকে যদি-বা ধরাধরি করে কাল টিলা থেকে নামানো যায়, নৌকো বাইতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা হল, এত কষ্ট করেও বাক্সটা পাওয়া গেল না। বাবা-মারাও তাহলে ফিরবে না। ওরা সবাই জানে রোজ রাতে নানি বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে।

যখন দুজনেরই বেজায় কান্না পেয়েছে, ঠিক তখনি বাজ-পড়া মরা গাছটা ওদের চোখে পড়ল। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ওরা ছুটে গেল তার কাছে। এই রকম গাছকেই বলে মহীরুহ। দুঃখের বিষয় মরে গেছে। কিন্তু মরেও মরেনি। মধ্যিখানের আসল গাছটাতে বাজ পড়েছিল। কিন্তু তার চারিদিকে ছড়ানো ডালপালা থেকে যে-সব লম্বমূল ঝুলে, এক সময় মাটিতে গেঁথে গিয়ে, এক একটি নতুন গাছের কাণ্ড হয়েছিল, তারাই এখন বাড়ন্ত ফলন্ত বটগাছ হয়ে, অতি-বৃদ্ধ-পিতামহকে তখনো ঘিরে রক্ষা করছে।

সেই বুড়ো গাছের ন্যাড়া ডালপালা চারদিকে আগের মতোই মেলে ধরা। তবে তাদের পাতা নেই। নতুন গাছের সঙ্গে যোগও নেই। মাঝখানের ডালগুলো কবে ভেঙে পড়েছে। কিছু না থাকলেও মাটি থেকে দু-হাত ওপরে মস্ত এক কোটর আছে। সে এত বড় কোটর যে তার মধ্যে পাঁচ-ছয়জন লোক অনায়াসে শুয়ে বসে থাকতে পারে।

ভিতরটা অন্ধকার। কেমন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। বাইরেটাতে আধখানা থালার মতো দেখতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা। সব মিলে আশ্চর্য, অদ্ভুত। এই রকম জায়গাই তারা খুঁজছিল। তখনো বাইরে সূর্য-ডোবার লালচে আলো ছিল। এই বেলা নোটোকে এখানে নামিয়ে আনতে হবে। জায়গাটা সামান্য একটু নীচে বলে, হঠাৎ কারো চোখে পড়েনি। আর সময় নষ্ট না করে ওরা নোটোর কাছে ছুটে গেল।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

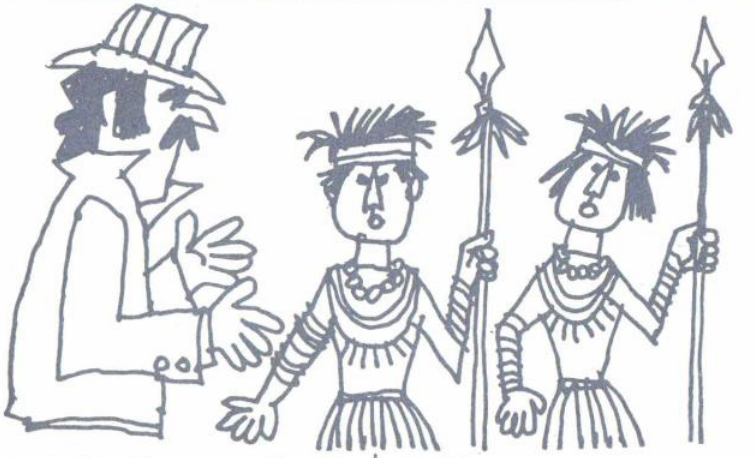

"সেই মিথ্যেবাদী আর সত্যবাদীদের নিয়ে আবার একটা নতুন ধাঁধা।" ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতে ছোট্‌কা বলল। ধাঁধার খাতাটার পাতা ওলটাচ্ছিল ছোট্‌কা, একটা জায়গায় পেনটা গুঁজে রেখে দিল, চট করে খুঁজে পাবার জন্যে, তারপর বলল, "ব্যাপারটা কী জানো সতুবাবু, এইসব ধাঁধা মাঝেমধ্যেই সমাধানের চেষ্টা করা ভাল, তাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়। এসব হল ক্লাসিক ধাঁধা।"

আমি ততক্ষণে খাতা-কলম খুলে বসে গেছি। ছোট্‌কা তাই দেখে আর কথা বাড়াল না। ধাঁধাটা বলে গেল।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা দ্বীপে দু-রকম অধিবাসী থাকে। একদলের নাম, ধরা যাক, আতান। অন্যদলের নাম, দেওয়া যাক, বাতান।

এখন ব্যাপার হল কী, আতানরা সবসময়ই মিথ্যে কথা বলে, বাতানরা সবসময় বলে সত্যি কথা। এদের চেহারা দেখে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই, কে আতান আর কে বাতান।

একদিন সেই দ্বীপে পৌঁছোলেন এক বিদেশী আগন্তুক। তাঁর দরকার বাতানদের সঙ্গে। তিনি দ্বীপে নেমে দেখলেন ওই দ্বীপের তিনজন অধিবাসী তাঁর দিকেই আসছে।

বিদেশী ভদ্রলোক প্রথম অধিবাসীকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি আতান না বাতান?" প্রথম অধিবাসীটি এমন আস্তে আর জড়ানো গলায় উত্তর দিল যে, আগন্তুক ভদ্রলোক কিছুই উদ্ধার করতে পারলেন না। তখন দ্বিতীয় দ্বীপবাসীটি আগন্তুক বিদেশীকে বলল, "ও বলল যে, ও হচ্ছে বাতান। ও সত্যি বাতান, আর আমিও তাই।" সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল সেই দ্বীপের তৃতীয় অধিবাসীটি, সে বলল, "বাজে কথা। প্রথম লোকটি বলেছে যে, ও হচ্ছে আতান। ও সত্যি আতান, আর আমি হলাম বাতান।"

আগন্তুক ভদ্রলোক খুবই বুদ্ধিমান। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেলেন যে, এই তিন অধিবাসীর মধ্যে কে আতান আর কে বাতান।

কী বুঝলেন তিনি, কীভাবেই বা বুঝলেন?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আগে-পরে দুটো অক্ষর বসিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করো—

—রগর—

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

তন্তনাদময়

গতবারের উত্তর ॥ (১) দুটো উত্তর দেওয়া হল : ৯৩৭৬+১০৮৬=১০৪৬২, ৯৪৮৬+১০৭৬=১০৫৬২। (২) বায়ুসেবন। (৩) মণি(কার)দানি।

সত্যসন্ধ

যেদিন আম্মার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।

শব্দ-সন্ধান

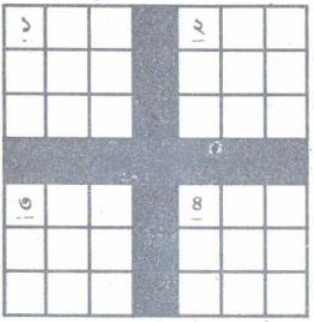

এবারের শব্দ-সন্ধানে লক্ষ করো, মাঝখানের কালো ক্রসটি ফাঁকা ঘরগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছে। প্রতিটি ভাগে পাশাপাশি পর-পর সংকেত অনুযায়ী শব্দ বসালেই দেখবে উপর-নীচেও পর-পর একই শব্দ হয়েছে।

সংকেত : (১ম ভাগ) ফুল। পৌরাণিক পর্বত, বাংলায় অর্থান্তর ঘটেছে। বায়ু। (২য় ভাগ) বাতিবিশেষ। শ্যামবর্ণা। কপাল। (৩য় ভাগ) অঞ্জন। নাচগানের অনুষ্ঠান। অঙ্কবিশেষ। (৪র্থ ভাগ) ঘোড়সওয়ারের পা-দানি। কথার-কথায় রুইমাছের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা সত্যি দারুণ মজার, আর এর জন্য কোনো উপকরণ চাই না। শুধু চাই একদল বন্ধু।

বন্ধুদের মধ্যে প্রথমে একজনকে ঠিক করে নিতে হবে, যে কিনা খেলাটা প্রথমবার পরিচালনা করবে। পরিচালকের সামনে সার বেঁধে দাঁড়াবে বাকি বন্ধুরা।

পরিচালক প্রথমে খেলাটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে। সে বন্ধুদের নির্দেশ দেবে, বন্ধুরা পালন করবে সেই নির্দেশ। এই নির্দেশ হবে দু-রকম ভাষায়। যখন পরিচালক এই বলে শুরু করবে যে, "ক্যাপ্টেন বলছে সবাই মাথা চুলকোও"—তখন সবাই সেই নির্দেশ মানবে। কিন্তু যে-সব নির্দেশ 'ক্যাপ্টেন বলছে' বলে শুরু হবে না, সে-সব নির্দেশ কেউ মানবে না। পরিচালক খুব দ্রুত নির্দেশ দিয়ে যাবে, কখনো 'ক্যাপ্টেন বলছে' বলে আসল নির্দেশ, কখনো মিছিমিছি নির্দেশ—অর্থাৎ যা 'ক্যাপ্টেন বলছে' বলে শুরু হবে না।

এই দু-রকম নির্দেশ তাড়াতাড়ি দিলে দেখা যাবে, অনেকেই ভুল করছে নির্দেশ মানতে এবং না-মানতে। যারা ভুল করবে, তারা আউট। এইভাবে যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, সে হবে পরেরবারের পরিচালক। সেও একইভাবে খেলবে। অর্থাৎ কখনো 'ক্যাপ্টেন বলছে' বলে নির্দেশ দেবে। কখনো এমনি-এমনি। দেখবে, কী দারুণ মজা হয় সত্যি-নির্দেশ আর মিথ্যে-নির্দেশ শুনে ঠিকমতো কাজ করতে গিয়ে।

মজারু

কিসের ফোটো

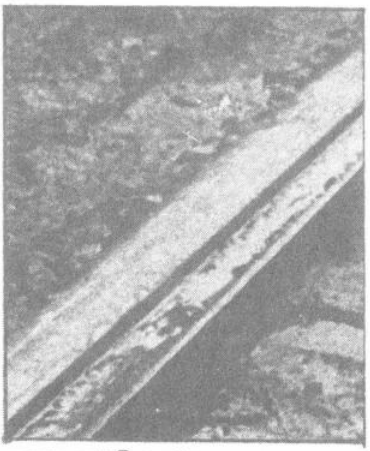

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ক্যামেরার লেন্সের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আগেরবার : তুমিই কি আমার চুল ছেঁটেছিলে ?

উঃ আজ্ঞে সেটা সম্ভব নয়, আমি মাত্র ছ-মাস হল এই সেলুনে কাজ নিয়েছি।

প্রঃ তোমার বাচ্চা কুকুরটা আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে জানো ?

উঃ বাচ্চা কুকুর কি মাথায় কামড়াতে পারে !

প্রঃ ক্লাসে একটি নতুন মুখ দেখছি !

উঃ নতুন নয় স্যার, এ-মুখটা আমার ১৩ বছরের পুরনো।

প্রঃ সমস্ত উত্তরপত্রটা কোটেশন মার্কে ভরে দিয়েছ কেন ?

উঃ উত্তরগুলো যে সবই পাশের ছেলের থেকে নেয়া।

সুসেন

হাসিখুশি

থার্মোমিটার ভুল করে দেখে ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত হয়ে ডাক্তারকে ফোন করলেন, "ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি আসুন। আমার ছেলের জ্বর ১২০।"

নির্লিপ্ত গলায় ডাক্তার জবাব দিলেন, "যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছু করার নেই। ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিন।"

"আমি তোমার দুঃখের অর্ধেক ভাগ নিতে রাজি আছি।"

"আমার কোনো দুঃখ নেই।"

"আমি বলছি, আমাদের মধ্যে যখন বন্ধুত্ব হবে তখন তো তোমার দুঃখের সীমা থাকবে না।"

"কী ব্যাপার বলুন তো, স্ট্যাচুটার মাথা নীচের দিকে কেন ?"

"ওটা যে বিখ্যাত যোগব্যায়ামবিদের স্ট্যাচু।"

"তোমার প্রিয় সংখ্যা কী কী পাপান ?"

"২০০, ৪২০, ৯০০।"

"বাঃ, বেশ। এবার ওগুলো চটপট যোগ করো তো।"

"না, না। আমার প্রিয় সংখ্যা ১ আর ২।"

ছবি : দেবাশিস দেব

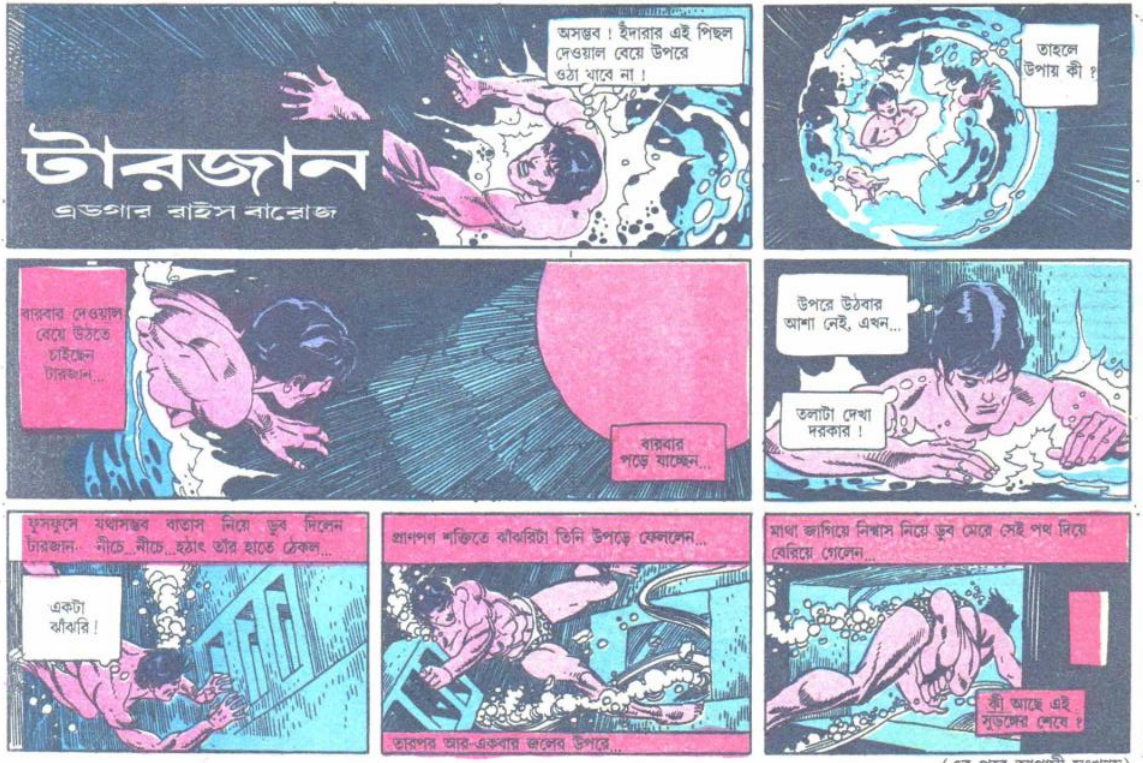

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
ভিক গাথরির বদমেজাজের জন্য সবাই তার উপরে খাপ্পা। প্যাকো ডিয়াজ কিন্তু তার দিকে। কিংসবের সঙ্গে খেলা চলছে। রোভার্স ১-২ পিছিয়ে।
সাপোর্টাররা না-বুঝে গাথরির নিন্দে করছে। ওরা বোকা !
চুপ করো প্যাকো !
তোমার সঙ্গে কথা আছে প্যাকো !
বেশ তো, চলো
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়েছে
কিন্তু বুঝতে পারছি না !
কিংসবে আবার চেপে ধরেছে রোভার্সকে...
গোলের মুখে বল ফেলছে !
ওইভাবেই, তো দুটো গোল হল
খারাপ খেলে না তো !
আঃ !
হঠাৎ বাজল রেফারির বাঁশি...
ফাউল দিয়েছে !
ডিরেক্ট ফ্রি-কিক !
যাচ্চলে !
রয় জানে, এটা ফাউল নয়...
গাথরিকে দেখছি বিনা-দোষে শাস্তি পেতে হয় !
রয়, ওয়াল-এ দাঁড়াও !

কিংসবের খেলোয়াড়রা গাঁথরিকে চটাতে চাইছে...
একটু সরে দাঁড়াও গাথরি!
কী করছ?
কী হচ্ছে
দরকার হয় তো তুমিই এদিকে এসো, একটু গল্পো করি!
এ কী!
বলা-টেলা কেমন চলছে বার্টিন?
আমি বিশেষ গোল-টোল পাচ্ছি না! তুমি পাচ্ছ?
রয়, হুঁশিয়ার!
বার্টিন অন্যমনস্ক হলে...
উঃ!
বার্টিন বলটা দেখতেই পায়নি
কিংসবে-ডিফেন্স প্রস্তুত হবার আগেই...
নাও, ব্র্যাকি
জব্বর বল দিয়েছে রয়
মাথা ছুঁইয়ে ব্র্যাকি বলটাকে গোলে পাঠাল!
গো-ও-ল!
রোভার্স ২, কিংসবে ২
বার্টিন অন্যমনস্ক না-হলে গোলটা ওরাই পেত!
যা বলেছ! এখন জেনে রাখো...
আমিই প্যাকোকে বলেছিলাম বার্টিনকে অনামনস্ক করে দিতে
ভিক গাথরির আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে...
মূর্তির সামনে মাথা নোয়ানোর চেয়ে এটাই জরুরি!
তবে কিনা ওটাও করতে হবে!
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
গাথরি কি মাথা নোয়াবে

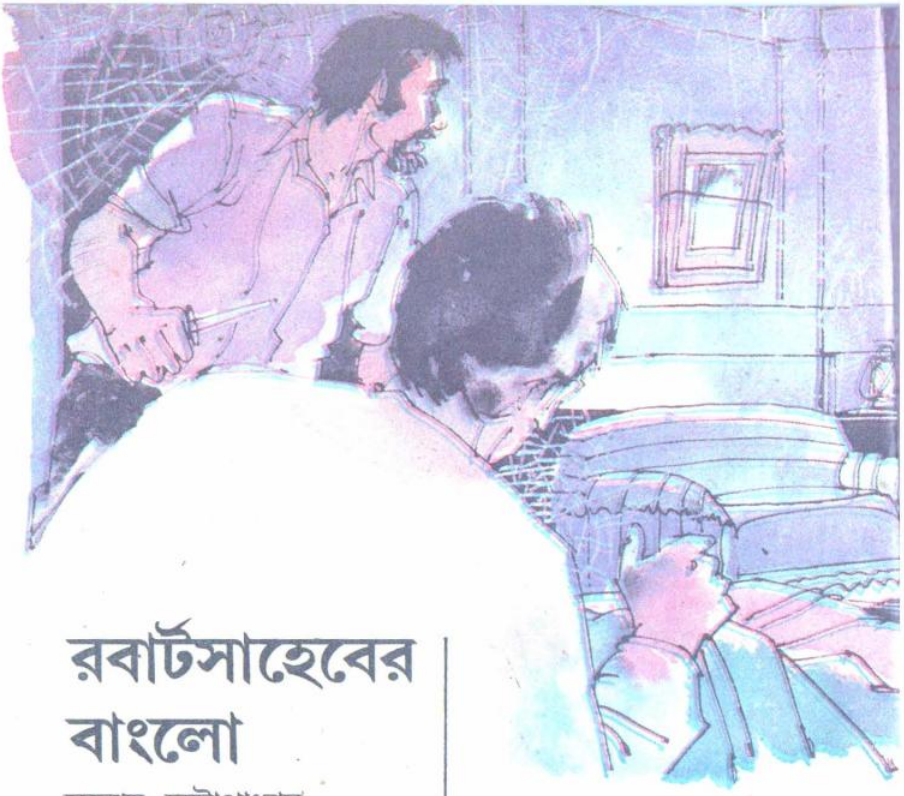

রবার্টসাহেবের বাংলো

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

চা-বাগানের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন ঠিক সাড়ে ছ'টা। আস্তে আস্তে অন্ধকার তার চাদর বিছিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমাদের পৌঁছবার কথা চল্লিশ কিলোমিটার দূরের শহরে, কিন্তু জিপবিভ্রাটে এখানেই থামতে হল। এই পথে রাত্তিরে জিপ চালানো মানেই বিপদ ডেকে আনা।

এছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। আমার অ্যাটাচিতে অনেক টাকা। সরকারি টাকা। এ-টাকার দায়িত্ব আমার, তাই এখানে একটা রাত্তির কাটিয়ে পরের দিন রওনা হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু রাত কাটাব কোথায়? চা-বাগানের কোয়ার্টার্স অনেক দূরে। সেখানেও আশ্রয় মিলবে কি না কে জানে! স্থানীয় কিছু লোকের কাছে শুনলাম চা-বাগানের পরেই শুরু হয়েছে জঙ্গল, সেখানে একটা ফরেস্ট-বাংলো আছে। আশায় বুক বেঁধে তাই সিকি মাইল দূরের ফরেস্ট বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম আমি আর আমার সঙ্গী জিপের ড্রাইভার বাহাদুর। বাহাদুর দারুণ বিশ্বাসী লোক, আর সাহসীও বটে।

ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে চৌকিদারের খোঁজ করতেই সে বেরিয়ে এল। এক রাতের মতো বাংলোয় থাকার কথা

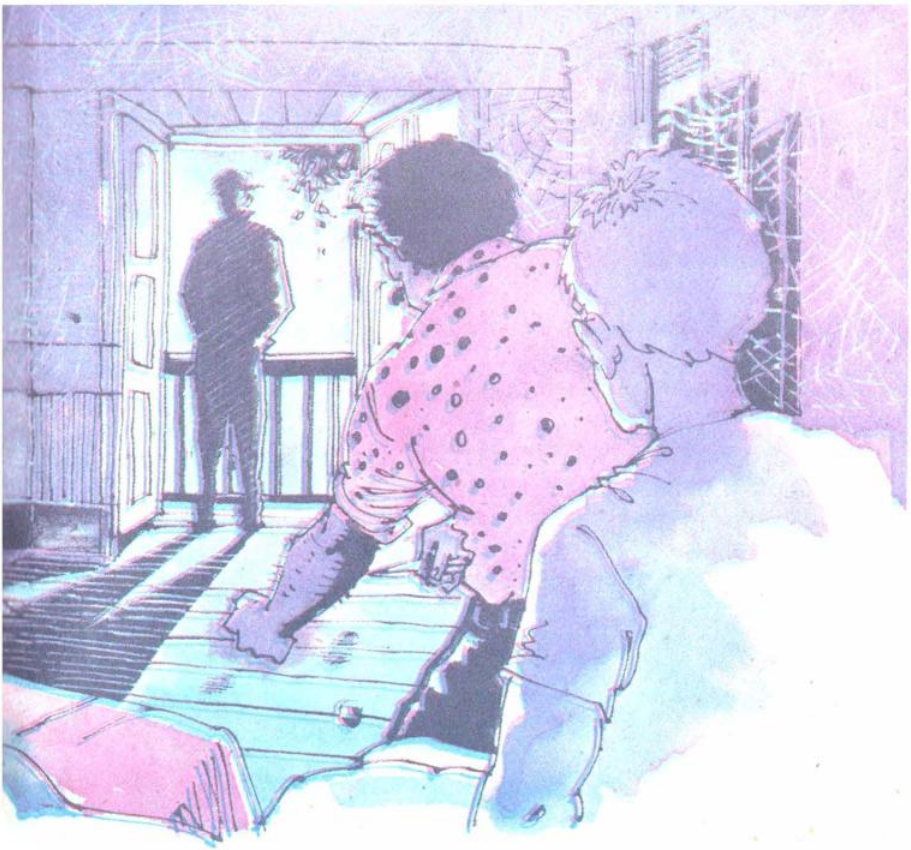

জানাতেই সে মাথা নাড়ল। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সরকারি কিছু অফিসারের আজই আসার কথা, অতএব আমাদের থাকতে দিয়ে সে চাকরি খোয়াতে রাজি নয়।

সত্যিই এবার মহা বিপদে পড়লাম। কোথায় আশ্রয় পাব ?

আমাদের অবস্থা দেখে চৌকিদারের বোধহয় একটু দয়া হল। সে একটু চিন্তা করে জানাল আমাদের এক রাতের মতো থাকার ব্যবস্থা সে হয়তো করে দিতে পারে, যদি আমরা রাজি থাকি।

রাজি ! আমরা তো তাহলে আকাশের চাঁদ পেয়ে যাব, সে কথাই বললাম।

চৌকিদার একটু ইতস্তত করে হিন্দিতে যা বলল তার অর্থ হল, একটু দূরেই জঙ্গলের সীমানায় একটা বাংলো আছে। লোকে বাংলোটাকে রবার্টসাহেবের বাংলো বলে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন রবার্টসাহেব। দুর্দান্ত সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি। তিনিই মস্ত বড় ওই বাংলো বানিয়েছিলেন। বাংলোটা এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে আছে। একটু বদনাম আছে বাংলোটার, তাই কেউ ওখানে থাকতে চায় না। রবার্টসাহেব মারা গেছেন

বহুদিন আগে। তখন থেকেই বাংলোটা খালি পড়ে আছে।

চৌকিদার এবার জানাল, আমরা রাজি থাকলে সে চাবি খুলে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

আমাদের তখন ভাবনার অবকাশ ছিল না। দু'জনে আছি, ভয়ের কী আছে? ভূতের ভয় আমাদের নেই।

চৌকিদার তখন ওর ছেলেকে ডাকল। বছর-পঁচিশের এক যুবক। ভিতর থেকে চাবি আর দুটো হ্যারিকেন এনে সে আমাদের রবার্টসাহেবের বাংলোতে পৌঁছে দিল। চৌকিদার আমাদের বলে দিয়েছিল, তার ছেলে আমাদের পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে, ওখানে থাকবে না।

রবার্টসাহেবের বাংলোটা বিশাল। সামনে রেলিং-ঘেরা বারান্দা। দু-ভাগে ভাগ করা বাংলো, চারদিকে অজস্র গাছ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কোনো রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

হ্যারিকেন আর ব্যাগ হাতে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। চৌকিদারের ছেলে ততক্ষণে চাবি দিয়ে মরচে-ধরা তালা খুলে ফেলেছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এল। বহুদিন ঘর ব্যবহার না করলে এই রকম গন্ধ হয়। হ্যারিকেনের আলোয় দেখলাম ঘরে তোশক-পাতা দুটো চৌকি আর দুটো চেয়ার আর একটা পায়া-ভাঙা টেবিল রয়েছে।

চৌকিদারের ছেলে আর থাকতে চাইল না। বার বার আমাদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সে বিদায় নিল। ওকে দেখে মনে হল কোনো কারণে ভয় পেয়েছে সে। কিন্তু কেন?

কিছু খাবার আমাদের সঙ্গে ছিল। হ্যারিকেনের আলোয় রাতের খাওয়া সেরে নিলাম আমরা। খাওয়া শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত দশটা বাজে। দরজা খুলে বাংলোর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই জঙ্গল। চাঁদের আলো যেন হালকা চাদরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে গাছের ওপর। নানারকম পোকার ডাক কানে আসছিল।

আচমকা বাহাদুর আমার হাত স্পর্শ করল। 'হুজুর, দেখিয়ে কোই আদমি!'

বাহাদুরের কথায় ডানদিকে তাকাতেই বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম একটা মূর্তিকে। ঠাণ্ডা বাতাসে ঠিক তখনই গাটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

লোকটির পরনে সাদা প্যান্ট আর শার্ট। মুখে পাইপ। দীর্ঘ চেহারা। জঙ্গলের দিকেই সে তাকিয়ে ছিল।

অস্পষ্ট আলোয় লোকটিকে ইউরোপীয় বলেই মনে হল। মনে মনে খুশিই হলাম, অন্তত একজনকে কাছে পাওয়া গেল।

লোকটি এবার ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল। অন্ধকারে মুখ দেখতে পেলাম না, তবে মনে হল সে আমাদের দেখে মাথা নোয়াল; তারপরেই ওদিকের ঘরে ঢুকে গেল।

এর পর দরজা বন্ধ করে দুটো চৌকিতে বাহাদুর আর আমি শুয়ে পড়লাম। অ্যাটাচিটা আমার মাথার নীচেই রাখলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জেগে উঠলাম। আর তখনই একটা দারুণ ভয় আমাকে চেপে ধরল। তাকাতেই দেখলাম ঘরের দরজা খোলা—সেখান দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোরা হাতে একটা লোক। চকিতে দেখে নিলাম বাহাদুরের সামনেও অন্য আর একজন।

"ব্যাগটা কোথায়?" লোকটা হিসহিস করে উঠল।

একটা দারুণ ভয়ের স্রোত আমার

মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে শুরু করেছিল। কোনো জবাব দিতে পারলাম না। আর ঠিক তখনই দরজার কাছে থেকে অদ্ভুত গলায় কে যেন বলে উঠল, "ছোড় দো উনকো!"

দুটো লোকই তড়িৎগতিতে ছোরা তুলে ঘুরে দাঁড়াল।

দরজার সামনে বাংলোর পাশের ঘরের সেই লোকটি। আমাদের আক্রমণকারীরা হঠাৎই চিৎকার করে ওই মূর্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হল ভয়ানক এক নাটক! সাদা পোশাকের ওই দীর্ঘকায় মানুষটি দু' হাত বাড়িয়ে দু'জন ডাকাতকে ঠিক ইঁদুরছানার মতোই তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে ভয়ংকর এক আর্তনাদ।

বাকি রাত কীভাবে কাটিয়েছিলাম সে ইতিহাস আজ আর মনে নেই। পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতেই হাজির হলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার আর পুলিশ। তাঁদের কাছেই শুনতে পেলাম জঙ্গলের মধ্যে দু'জন কুখ্যাত ডাকাতের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কেউ তাদের ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

আমি আর বাহাদুর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

আমাদের মনে একই প্রশ্ন খেলে গেল। আমাদের ডাকাত দু'জনের হাত থেকে যিনি রক্ষা করেছেন তিনি কে? প্রশ্নটা ফরেস্ট অফিসারকে করে বাংলোর অন্য অতিথির কথা জানতে চাইলাম।

"অন্য অতিথি?" অফিসার অবাক হয়ে বললেন, "এ বাংলোয় গত ছ'মাসের মধ্যে কেউ আসেনি।"

তাহলে আমাদের বাঁচাল কে? ডাকাতদেরই বা হত্যা করলে কে?

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সেমসাইড

অভীক বসু

পুষেছি কুকুর এক
নাম তার টমি,
বাইরেই ঘোরে ফেরে
ঘরে থাকে কমই।
তেলে-ভাজা ঘিয়ে-ভাজা
কুত্তার দল
দল বেঁধে দেয় তারা
পাড়ায় টহল।
ভেউ ভেউ, ঘেউ ঘেউ
হাঁকডাক জোর,
ফাঁক পেলে তাক করে
ফেরিওলা চোর।
একদিন দেখি টমি
হল দলছাড়া—
"কেউ কি মেরেছে টমি?
নাম বল, কারা!"
টমি এসে বসে পাশে
চোখভরা জল,
বলে, "প্রভু, বন্ধুটি
হয়েছে পাগল।
তাই ভয়ে ঢুকে গেছি
ঘরের ভিতর
পাগল কুকুর নাকি
বড়ই ইতর।
একবার কামড়ালে
চোদ্দটি সুঁই—
এ বিধান দিয়েছেন
পাস্তুর লুই।"

উল্‌ফ ব্যাটা মহা পাজি ! কোথায় লুকিয়ে কী সর্বনাশ করছে কে জানে

একটা চিঠি !

আরে, এ কী কাণ্ড !

পড়ে শোনাও

বিদায় । আমি মহাশূন্যে ঝাঁপ দিলুম । এর ফলে কিছুটা অক্সিজেন বাঁচবে, এবং তোমরা হয়তো নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারবে । যে-ক্ষতি আমার দ্বারা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাই ।—

উল্‌ফ

কিন্তু বাইরের দরজা খুললে তো মোটর বন্ধ হয়ে যাবার কথা !

আরও আছে । শোনো ।

পাছে মোটর বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে, তাই কয়েকটা তার কেটে দিয়েছি । তোমরা সেগুলি সহজেই জোড়া লাগিয়ে নিতে পারবে ।

উল্‌ফ

আশ্চর্য ! আমাদের বাঁচাবার জন্য লোকটা মৃত্যুবরণ করল ?

হ্যাঁ । তাতেও আমরা বাঁচব কিনা, কে জানে । তুমি এবারে উপরে যাও ।

এই যে ! পাজি উলফের খোঁজ পেলেন ?

কী, উল্‌ফ পাজি ? ফের তাকে পাজি বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব !

সেই মুহূর্তে

আর্থ টু মুন-রকেট... আর দশ মিনিট পরেই রকেটের মুখ ঘোরাতে হবে ।

ঠিক আছে ।

পনর মিনিট বাদে...

আর্থ টু মুন-রকেট... মুখ ঘুরেছে... ভয় পেও না... দু' ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা পৃথিবীতে ফিরে আসছ ।

অক্সিজেনের যা অবস্থা, দু' ঘণ্টা বাঁচব না ।

মরতে যখন হবেই...তখন আর চিন্তা কী !

কোথায় যাচ্ছ ক্যাপ্টেন ?

বোতলটা শেষ করে তারপর মরব !

আর আমি মরতে ভয় পাই না !

যথেষ্ট হয়েছে ! এবারে শুয়ে পড়ো !

শুয়ে পড়তে আমার বয়েই গেছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দি অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যয়ার

মার্ক টোয়েন

ভাষান্তর : শেখর বসু

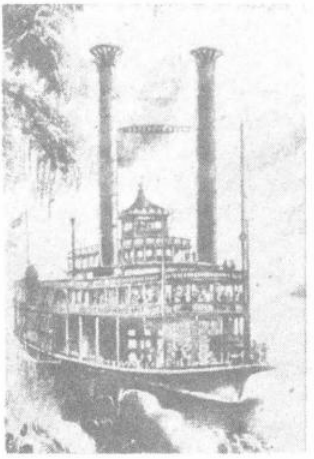

॥ ২ ॥

সন্ধে হতেই লোকদুটো বেরিয়ে পড়ল পোড়োবাড়ি ছেড়ে। তার একটু পরেই টম আর হাক ছুট লাগাল ওখান থেকে। নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পরে দুই বন্ধুর ফুর্তি দেখে কে! জো আর স্প্যানিয়ার্ড কাল সকালে পোড়োবাড়িতে পৌঁছবার আগেই ওরা গুপ্তধনটা হাতিয়ে নেবে। কিন্তু পরদিনই খবর পাওয়া গেল, স্প্যানিয়ার্ড উধাও, আর এক জায়গায় পড়ে আছে জোয়ের ছুরি। দুই বন্ধুই পরিষ্কার বুঝতে পারল স্প্যানিয়ার্ডের কী হয়েছে! কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় ওরা চুপ করে রইল। পোড়োবাড়িটার দিকেও পা বাড়াল না আর।

এদিকে আস্তে আস্তে গরমের ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পরে টমদের স্কুল খুলল আবার। জজ থ্যাচারের মেয়ে বেকি টমের সহপাঠিনী। বেকির সঙ্গে টমের খুব ভাব। বেকি ওকে বলল : কাল আমাদের ছুটি, আমরা পিকনিকে যাব, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। টম রাজি হয়ে গেল এককথায়।

মাঝরাত্তিরে হাক টমদের বাড়ির কাছে বেড়ালডাক ডাকতেই বেরিয়ে এল টম। টম বন্ধুকে বলল : আমি তো কাল পিকনিকে যাচ্ছি, তুই কিন্তু চোখ রাখিস সবদিকে। হাক ঘাড় নেড়ে জবাব দিল : ঠিক আছে।

সেই ভোরেই হঠাৎ হাকের চোখে পড়ল জো আর স্প্যানিয়ার্ড। ওদের দেখে চমকে উঠল হাক। কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। ও বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ওদের পিছু নিল। তারপর আড়াল থেকে ওদের কথা কানে যেতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল হাকের। জো বিধবা ডগলাসের নাক-কান কেটে দেবার জন্যে যাচ্ছে। বিধবার স্বামী ছিলেন একজন বিচারক। তিনি জোকে জেলে পাঠিয়েছিলেন কয়েকবার। সেই রাগেই জো এখন শোধ তুলতে যাচ্ছে বিধবার ওপর। ওদের মতলবের কথা টের পেয়ে হাক ছুটল ডগলাসের প্রতিবেশীর কাছে। তারপর ওদের সাহায্যে জো আর স্প্যানিয়ার্ডকে তাড়াল। বেঁচে গেলেন বিধবা।

এদিকে সকাল দশটায় পিকনিক-পার্টির ছেলেমেয়েরা জজ থ্যাচারের বাড়িতে এসে হাজির হল। প্রচুর খাবারদাবার নেওয়া হয়েছে সঙ্গে। ওরা বেরুবার আগে মিসেস থ্যাচার একফাঁকে মেয়েকে ডেকে বললেন,

"ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। তুমি অযথা আর ঝুঁকি নিও না, রাত্তিরটা কাছাকাছি কোনো বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে দিও।"

তাই শুনে বেকি খুব খুশি। "তাহলে আমি সুসি হারপারদের বাড়িতে থাকব মা।"

উত্তরে মা বললেন, "বেশ।"

যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের বোঝাই করে একটা পুরনো স্টিম ফেরিবোট ম্যাক্‌ডগ্‌লাস গুহার উদ্দেশে হওনা হল। নৌকোয় উঠেই টম বেকিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "দূর! হারপারদের বাড়িতে থাকার কোনো মানে হয় না। আমরা বরং বিধবা ডগলাসের বাড়িতে থাকব। ওখানে অনেক আইসক্রিম আছে, মজা করে খাওয়া যাবে দুজনে।"

একটু গাঁইগুঁই করে রাজি হয়ে গেল বেকি।

কিছুক্ষণ বাদে নৌকো এসে ভিড়ল ম্যাক্‌ডগ্‌লাস গুহার ঘাটে। ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে নেমে পড়ল। তারপর পেটপুরে প্রচুর খাওয়াদাওয়া করে অনেক মোমবাতি হাতে নিয়ে সবাই গিয়ে ঢুকে পড়ল গুহায়।

বিশাল গুহা, ঘুরে-ঘুরে কদ্দূর গেছে কে জানে! বেশি দূরে গেলে পথ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু টম আর বেকি বিপদের কথা ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে গল্প করতে করতে গুহার অনেক ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর এক সময় পেছন ফিরে দেখে, বন্ধুদের কেউ কোথাও নেই!

বন্ধুদের নাম ধরে ওরা গলা ফাটিয়ে কত ডাকল, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। বেচারা টম আর বেকি পথ হারিয়ে ফেলেছে ভয়ংকর সেই গুহার মধ্যে।

পরদিন রোববার। রোববার গির্জায় আসে সবাই। মিসেস হারপারকে দেখে মিসেস থ্যাচার জিজ্ঞেস করলেন, "বেকির কী খবর? কাল সারাদিন দুষ্টুমি করে এখন বোধহয় খুব ঘুমোচ্ছে, না?"

"মানে?" অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন মিসেস হারপার।

"বেকি কাল রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে ছিল না?"

"না তো!"

ইতিমধ্যে পলিমাসিও ওখানে হাজির হয়েছেন টমের খোঁজ নিতে। কিন্তু কেউ ওদের খোঁজ দিতে পারল না। শেষে একটা ছেলে বলল, টম আর বেকি বোধহয় গুহাতেই রয়ে গেছে।

তাই শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পলিমাসি আর মিসেস থ্যাচার।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শ'দুয়েক লোক ছুটল ওই গুহায়। তিনদিন তিনরাত্তির ধরে কত খোঁজাখুঁজি হল চারদিকে, কিন্তু টম আর বেকির কোনো হদিশই পাওয়া গেল না।

ওদিকে, ভয়ংকর ওই গুহার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে ওরা দুজনে। বেরুবার পথ ওরা আর কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ধকার গুহা। একটা মোমবাতি শেষ হলে আর একটা মোমবাতি ধরিয়ে নিচ্ছে টম। পোড়া মোমবাতির সংখ্যা দেখে ও পরিষ্কার বুঝতে পারল, ফেরিবোট ওদের ফেলে চলে গেছে বহুক্ষণ।

ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দুই বন্ধু। বেকি তো কেঁদেই ফেলল কয়েকবার, টম অনেক কষ্টে শান্ত করেছে ওকে। এক টুকরো কেক ছিল টমের পকেটে, একটু-একটু করে তাই ভাগ করে খেয়েছে দুজনে।

বিশাল গুহার মধ্যে ঝর্না আর একটা লেক চোখে পড়ল ওদের। প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল, পেট ভরে জল খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল দুজনে। ঘুম থেকে ওঠার পরে ওদের শরীর তাজা হল কিছুটা। কিন্তু তাজা ভাবটা থাকল না বেশিক্ষণ। আবার খিদে, আবার ক্লান্তি।

একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর—
আমায় দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সমস্তটা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর।**
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা—হাতি—বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর।**

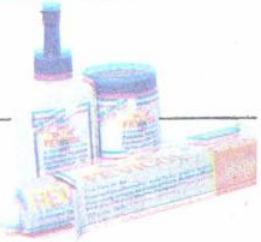

জিফি জোকার কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী" পোস্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই-৪০০ ০২০

নাম ____________________

বয়স ____________________

ঠিকানা ____________________

(A)

ফেভিকল এম-আর

সিন্থেটিক অ্যাডহেসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® Both and **FEVICOL** brand are the Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD., Bombay 400 021

.OBM/1683

গুহা থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে গিয়ে ওরা একবার কয়েক হাজার বাদুড়ের খপ্পরে পড়েছিল। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, কোনোরকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল ওরা। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ টিকে থাকা যাবে! গুহা থেকে বেরুবার পথ কোথায়?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে টমের মাথায়। ও পকেট থেকে ঘুড়ির সুতো বার করে একটা পাথরের কোনায় বেঁধে বেকির হাত ধরে বলল, "চলো, আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি। বেরুবার পথ না পেলে আবার সুতো ধরে ফিরে আসব এখানে।"

গুহার কয়েকটা বাঁক ঘোরার পরে হঠাৎ ওরা দেখতে পেল পাথরের আড়াল থেকে জ্বলন্ত মোমবাতি-ধরা একটা হাত বেরিয়ে আসছে। যার হাত সেই লোকটাকে একটু পরে দেখা যেতেই ভয়ে বুক উড়ে গেল টমের। ইনজুন জো! তার পেছন-পেছন সেই স্প্যানিয়ার্ডটা।

বেকির হাতে একটা ঝটকা মেরে পেছন দিকে ছুট লাগাল টম।

ঝর্নার ধারে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরে টম বলল, "বেকি, চলো গুহার ওধারটা একবার দেখে আসি।" কিন্তু বেকি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে ও বলল, "তুমি একাই যাও। আমি এখানেই আছি।"

সুতোর নিশানা হাতে নিয়ে টম গুহার ওধারে গেল, তারপরেই ছুটতে -ছুটতে ফিরে এসে বলল, "বেকি, শিগ্‌গির এসো, গুহা থেকে বেরুবার পথ দেখতে পেয়েছি।"

ক'দিন কেটে গেছে কে জানে! ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত দুটি ছেলেমেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল মৃত্যু-গুহা থেকে। তারপর আরও আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল ওদের গাঁয়ের দিকে।

এদিকে পলিমাসি আর মিসেস থ্যাচার কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। গাঁয়ের লোকদেরও মন খুব খারাপ। চারদিন হয়ে গেল অথচ ছেলে-মেয়েদুটোর কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না! হঠাৎ বৃহস্পতিবার মাঝরাত্তিরে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং-ঢং করে। কী ব্যাপার?

খবর জানার জন্যে সবাই ছুটল গির্জায়। দারুণ সুখবর। টম আর বেকি ফিরে এসেছে। খিদে-তেষ্টা আর কষ্টে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে বেচারারা। ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে সবাই খুব আদর করল। তারপরেই কয়েকজন ছুটল জজ থ্যাচারকে সুখবরটা দেওয়ার জন্যে। জজসাহেব দলবল নিয়ে আবার সেই গুহায় গেছেন বাচ্চাদের খোঁজে।

বাচ্চারা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে

ফুল যেমন ওঠে ফুটে অপূর্ব
সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে, আপনার
রঙের বাহারও তেমনি
ধীরে ধীরে উঠবে ফুটে,
সৌন্দর্য্যের চমক লাগিয়ে!
আপনার সৌন্দর্যে চমক জাগান, স্বাভাবিক উপায়ে — ল্যাকটো-ক্যালামাইন দিয়ে। আপনার রঙ, উজ্জ্বল দীপ্তিময় ও নিখুঁত ক'রে তোলার জন্যেই এটির প্রয়োজন। ঔষধিযুক্ত ক্যালামাইন আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে, ত্বকের যত্ন নেয় — এর ময়েশ্চারাইজার রাখে ত্বককে শিশির-কোমল ও তরতাজা করে — আর এর অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট, মুখের ত্বককে টানো টানো শোভাময় ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে। তাই তো, আপনার মত শোভাময়ী সুন্দরীরা, বছরের পর বছর ধরে ল্যাকটো-ক্যালামাইনএর ওপরই ভরসা ক'রে থাকেন।
তিনটি সাইজে পাওয়া যায়।
CROOKES
Lacto-Calamine
ক্যালামাইন • ময়েশ্চারাইজার • অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট
রঙের বাহার সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে
GJA: 1154 Ben

শুনে জজ থ্যাচার আর তাঁর সঙ্গীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে এলেন বাড়িতে। টম তখন কৌতূহলী শ্রোতাদের সামনে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলছিল সবিস্তারে। জজসাহেব টমকে খুব আদর করে বললেন, "শাবাশ ! তুমি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তবে, ওই সর্বনেশে গুহায় যাতে আর কেউ ঢুকতে না পারে সেইজন্যে আমি মস্ত একটা দরজা বসিয়ে দিয়ে এসেছি গুহার মুখে।"

শুনে মুখ কালো হয়ে গেল টমের। কী ব্যাপার ?

টম তখন আমতা-আমতা করে জানাল, ওই গুহায় সে ইন্‌জুন জো আর স্প্যানিয়ার্ডকে দেখেছে। তাই শুনে আবার লোক ছুটল গুহায়। কিন্তু ততক্ষণে খুব

এর পর আংকল টম্‌স কেবিন

দেরি হয়ে গেছে। দরজা খুলে দেখা গেল গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছে ইন্‌জুন জো, তার বগলে গুপ্তধনের বাক্স। স্প্যানিয়ার্ডকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও !

টম এবার সবাইকে তাদের সেই গুপ্তধন অভিযানের কাহিনী শোনাল। শুনে সবাই চমৎকৃত। আর জানা গেল কী করে হাকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বিধবা ডগলাস।

সব শুনে রায় দিলেন জজসাহেব : জোয়ের ওই গুপ্তধনের বাক্স টমের প্রাপ্য। কিন্তু সব সম্পত্তি টম একা নিতে রাজি হল না, এর অর্ধেক দিতে হবে হাককে। টমের কথায় সায় দিল সবাই। শেষে ঠিক হল, সব টাকা-পয়সা টম আর হাকের নামে রেখে দেওয়া হবে ব্যাঙ্কে। সুদের টাকায় ওদের পড়াশুনোর খরচ চলে যাবে দিব্যি।

প্রস্তাবটা সবার খুব মনোমত হলেও হাক খুশি হল না একটুও। দিব্যি ও হেসেখেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল চারদিকে, এখন ওকে বন্দী হয়ে পড়াশুনো করতে হবে ! টম অবশ্য অনেক কষ্টে মত করাল বন্ধুর। একটু-আধটু লেখাপড়া করাটা কী এমন কষ্টের !

(সমাপ্ত)

মার্ক **টোয়েন** (১৮৩৫—১৯১০) : প্রখ্যাত এই মার্কিন লেখকের 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যায়ার' (১৮৭৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড় সকলের মন কেড়ে নিয়েছিল বইটি। মিসিসিপি নদীর ধারে লেখকের ঘটনাবহুল বাল্যজীবন কেটেছিল, তার ছায়া আছে অবিস্মরণীয় এই গ্রন্থটিতে। মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম, এই নামেই লেখক জগদ্বিখ্যাত। কম্পোজিটর, স্টিমবোট রিভার পাইলট, পত্র-পত্রিকার চাকরি ইত্যাদি নানা কাজ করেছেন নানা বয়সে। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সহজ, সরল কথ্যভাষায় লেখা। ভঙ্গি প্রায় সর্বত্রই সরস। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকায় আছে 'দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার' এবং 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন' (১৮৮৫)। শেষের এই বইটির প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একবার বলেছিলেন, "মার্কিন সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে এই বইটি থেকেই।" পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছেন মার্ক টোয়েন।

খুদে ক্যামেরাম্যান

তুলসী সেনগুপ্ত

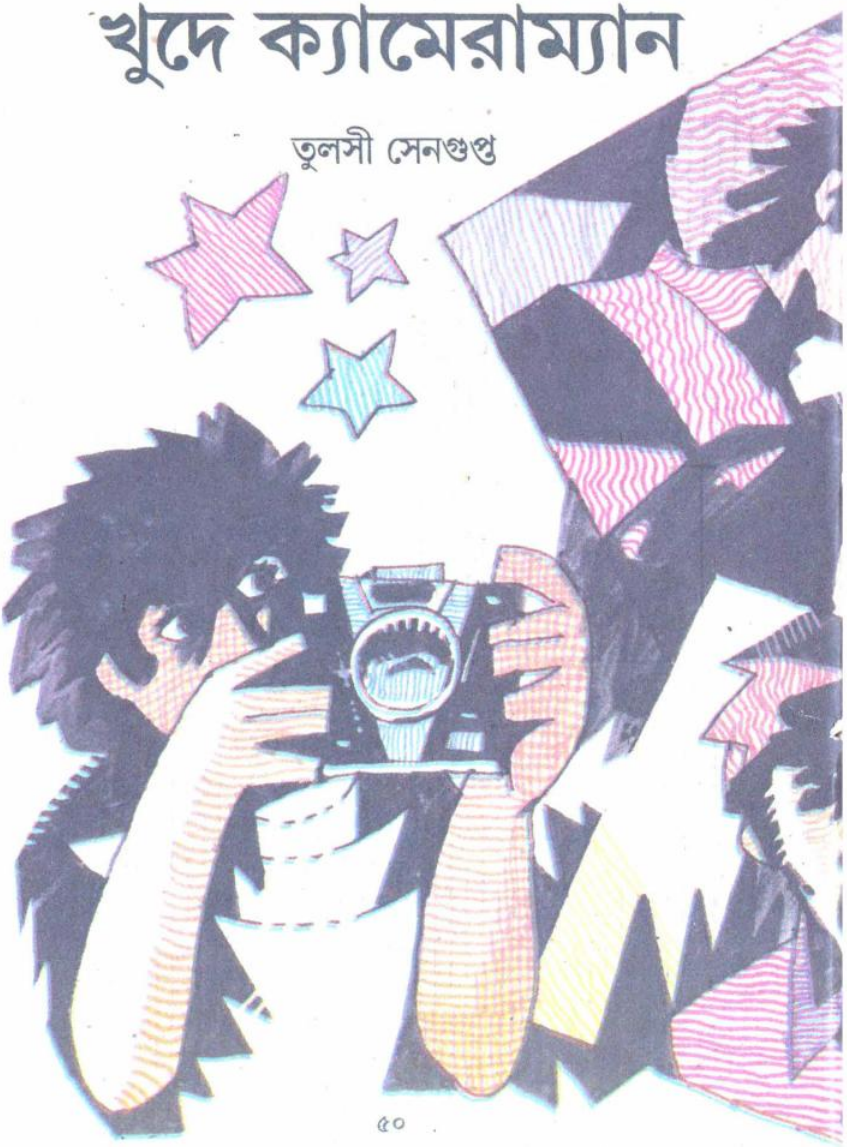

অঙ্কে ভাল ফল করতে পারেনি বলে শুভ্র মা'র কাছ থেকে বকুনি খাচ্ছিল খুব। শুভ্র কাঁদো-কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মা'র মুখটা থমথমে মেঘের মতো হয়েছিল। ওকে অমন চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগ ক্রমশই বাড়ছিল মা'র। এক সময় সব রাগ গিয়ে পড়ল ছোটকাকার ওপর। বলছিলেন, "এর জন্য দায়ী হচ্ছে তোর ছোটকাকা।"

পাশের ঘরে ওর বাবা সৌরেনবাবু পরিবেশ দূষণের ওপর জোরদার প্রবন্ধ লিখছিলেন। কথাটা কানে যেতেই ধাক্কা খেলেন। লেখা থামিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ফের আর একটা ধাক্কায় সোজা হয়ে বসলেন।

মা বলছিলেন, "যেমন বাপ, তেমন কাকা। একজন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দেশসেবা করেন, আর একজন অষ্টপ্রহর ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ধিং-ধিং করে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেটা অমানুষ হচ্ছে, এটা কেউ খেয়ালই করছে না।"

মা'র কথা বলার ঢঙে মুখ টিপে না হেসে পারেনি শুভ্র। ভাবছিল, ঠিক এ-সময় যদি ছোটকাকা এসে পড়তেন তো খেলাটা কী সুন্দরই না জমত!

মা বলছিলেন, "ফাইনালেও যদি এরকম নম্বর পাস তো কলেজেই ভর্তি হতে পারবি না। ও বাড়ির মধুসূদনবাবুর ছেলেও তো এবার এরকম নম্বর পেয়েছে। কই পারল ভাল কলেজে ভর্তি হতে?" শুভ্র আর দাঁড়াল না। ও জানে মধুসূদনকাকুর ছেলে সুমিত বরাবরই বলে এসেছে, ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করবে। সকলেই বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করে মাথা খারাপ করছে। ও দেখিয়ে দেবে সাহিত্য পড়েও মানুষ হওয়া যায়। ওর বিশ্বাস সুমিত তা পারবে।

শুভ্রকে যেতে দেখেই সৌরেনবাবু ওকে ইশারায় ঘরে ডাকলেন। শুভ্র কাছে আসতেই বললেন, "প্রগ্রেস-রিপোর্ট দেখি।"

শুভ্র প্রগ্রেস-রিপোর্ট এগিয়ে দিয়ে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে বললেন সৌরেনবাবু, "তোর মা'র কথা তো শুনলি। এবার চেষ্টা কর, যাতে আরও ভাল নম্বর করতে পারিস।" ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবি?"

শুভ্রর চোখে জল এসে গেল। বলল, "মা মিছিমিছি ছোটকাকাকে দোষ দেন।"

"দূর বোকা। ওকে কি দোষ দেওয়া বলে! জানিস না, ওই ইয়াসিকা ক্যামেরাটা তো তোর মা-ই কিনে দিয়েছিলেন অমুকে। অমু ভাল ছবি তোলে, ভাল ক্যামেরা ছাড়া কি বড় ফোটোগ্রাফার হওয়া যায়?" কথাটা শুনে শুভ্রর খুব আনন্দ হয়েছিল। মা'কে যেন নতুন করে চিনল শুভ্র। ও খুশি মনে নিজের ঘরে চলে এল। সামান্য ভুলের জন্য দুটো অঙ্ক ওর কাটা গেছে, নইলে নব্বুই পেতে পারত। ভাবল, মা হয়তো তখনও বলতেন, একশো পেলিনে কেন? ও পড়ার টেবিলে একটা মোটা খাম দেখতে পেল। খামটা খুলতেই তো অবাক। গত সপ্তাহে ছোটকাকা বাইরে গিয়েছিলেন। সে-সব জায়গার ছবি প্রিন্ট করে ওর পড়ার টেবিলে রেখে গেছেন ছোটকাকা। মা'র বকুনি, অঙ্কটঙ্ক সব মাথায় উঠল শুভ্রর। একের পর এক ছবিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল। ছবি তো নয়, জীবন্ত সবকিছু যেন ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। খরায় ফুটিফাটা মাঠের মাঝে একটা গাছে অনেক পাখির ভিড়। পাখিগুলোও ভীষণ তৃষ্ণার্ত। আর একটা ছবিতে হাঁদারার পাশে শ'দুয়েক নর-নারীর ভিড়। ছবিটা দেখে নিজেরও ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে গেল। এক গেলাস জল খেয়ে আর একটা ছবি টেনে বের করল। ব্রহ্মপুত্রের ভয়াল-ভয়ঙ্কর বন্যার ছবি। ঘর-দোর সব ভেসে গেছে। শুধু জল আর জল! একটা বড় গাছের ডালে ভয়ার্ত মুখে দু-একজন আশ্রয় নিয়ে আছে। আর একটা ছবিতে প্রকৃতির শিবরূপ। সবুজ-শ্যামলে ভরে আছে মাঠ। পিঠে বাচ্চা নিয়ে কৃষক-রমণীর মুখে অনাবিল হাসি। শুভ্র মনে মনে ভাবল, ছোটকাকা একজন শিল্পী। শিল্পী বলেই না এরকম ছবি তুলতে পারেন। একটা ছোট কাগজে ছোটকাকাকে উদ্দেশ করে লিখল, "অজস্র অভিনন্দন ছোটকাকা। ছবিগুলোর

ক্যাপশন দিচ্ছি, 'ভয়ংকর সুন্দর'।"কাগজটা এবার খামের ভেতরে পুরে ছোটকাকার ঘরে রেখে পড়ায় মন দিল শুভ্র।

॥ ২ ॥

লম্বায় প্রায় ছ-ফুট, ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা রঙ, চোখদুটো ভাসা-ভাসা। ব্যাকব্রাশ করা বড়-বড় কাঁচা-পাকা মাথার চুল ছোটকাকার।

শুভ্র এবার বুঝেছে, মা মুখে যত কথাই বলুন না কেন, ছোটকাকার জন্য একধরনের গর্বও আছে। এই তো গত বছর ফোটোগ্রাফিক কম্পিটিশনে ছোটকাকা প্রথম পুরস্কার নিয়ে এলেন। কলকাতার সব খবরের কাগজে ছোটকাকার ছবি দিয়ে কত প্রশংসাই না করেছে।

ওর প্রশংসাপত্র ছোটকাকার চোখে পড়েছে কি না ভাবতে না ভাবতেই ছোটকাকা ওর ঘরে ঢুকে বললেন, "চমৎকার ক্যাপশন দিয়েছিস শুভ্র। 'ভয়ংকর সুন্দর'। সত্যিই প্রকৃতি তাই। তোকে তোর জন্মদিনে জম্পেশ একটা উপহার দেব।"

শুভ্র বলল, "তোমার মতো আর্টিস্ট হতে পারলে···।"

বাধা দিলেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "আর্টিস্ট হতে চাস ভাল কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ক্যামেরাম্যানদের কেউ আর্টিস্ট বলে না। বলে, ফোটোগ্রাফার। ফোটোগ্রাফিও যে আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে, এ বোধ-বুদ্ধি ক'জনের আছে।" শুভ্রকে কোনো কথা বলতে না দেখে ফের বললেন, "আমি তো সব সময় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছি না। তুই লেন্সে চোখ রেখে এটা-সেটা শিখে নিতে পারিস। কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুললে ছবিটা জীবন্ত হয়, এটা নিজেরই বুঝে নিতে হয়। এর

জন্য আলাদা একটা চোখ থাকা দরকার। লেখক-কবিদের যেমন থাকে। সবই তো আমরা দেখি, কিন্তু ওরা যখন দেখেন, তখন তার ভেতর থেকেই আলাদা এমন একটা কিছু বেরিয়ে আসে যা প্রকাশ হবার পর মনে হয়, আরে এ তো আমিও দেখেছি। তবে পারলাম না কেন?" বলেই হো হো করে হাসছিলেন অমিতজ্যোতি।

শুভ্র বলল, "তোমাকে সকলে ভুল বোঝে কেন ছোটকাকা?"

অমিতজ্যোতি আরও জোরে হেসে ফেলেন। বলেন, "একটা প্রবাদ আছে পহেলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি।"

শুভ্র একটুও দেরি না করে বলে, "তুমি তো দেখতে খুব সুন্দর। রজত একদিন বলছিল—" কথাটা শেষ না করে মুখ টিপে হাসল শুভ্র।

অমিতজ্যোতি প্রশ্ন করলেন, "হাসছিস কেন?"

শুভ্র পেটে বেশিক্ষণ কথা চেপে রাখতে পারে না। বলল, "রজতের বাবা-মা নাকি বলাবলি করছিলেন, তুমি সিনেমায় নামলে নায়ক হতে পারতে।"

"বলছিলেন বুঝি? তাহলে শোন, কথাটা আমারও দু-একবার মনে হয়েছিল। তারপর নিজে থেকেই ঠিক করেছিলাম, ও সব কম্ম আমার দ্বারা হবে না। দু একবার শ্যুটিং দেখতে স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। ওহ্, কী ভীষণ গরম। তার ওপর মুখে যখন বড়-বড় আলো এসে পড়ে তখন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওসব যাঁরা করেন তাঁরা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তা ছাড়া কী জানিস, ও সব কাজে খুব একটা স্বাধীনতা নেই। আর আমারটায় আমিই সব। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলব, বিষয়বস্তু কী হবে, সবই ঠিক করব আমি। সেখানে কারও মাতব্বরি চলবে না।"

শুভ্র বলল, "সকলেই সব কিছু পারে না।"

কথার মোড় ঘুরিয়ে অমিতজ্যোতি এবার ম্লান হেসে বলেন, "রেজাল্ট নাকি তোর ভাল হয়নি ?"

"থার্ড হয়েছি। দেখো না, মা তাতেই চটেমটে লাল।"

"দাদা শুনে হাসছিলেন তো ?"

"হাসেননি, তবে আরও ভাল রেজাল্ট করতে বলেছেন।"

অমিতজ্যোতি সে-কথা শুনে হেসে বললেন, "দাদা-বৌদি যেন ঠিক শিব-পার্বতী।"

শুভ্র প্রতিবাদ করে বলে, "পার্বতী কখনও এত ঝগড়টে হয় ?"

"ওঃ বাব্বা ! জানিস না বুঝি। পার্বতী কথায়-কথায় ভয় দেখান বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে।"

"কেন ?"

অমিতজ্যোতি হেসে বললেন, "সে খুব মজার ব্যাপার। শিব তো ভোলানাথ। সংসারে তাঁর মনই নেই। এ দিকে গণেশের বাহন ইঁদুর ঘরের চাল-ডাল সব শেষ করে দিয়েছে। পার্বতী রান্না করতে গিয়ে দেখেন, একদানা চালও নেই। এদিকে খিদের জ্বালায় কার্তিক কাঁদেন, গণেশ কাঁদেন, লক্ষ্মী-সরস্বতীও কাঁদেন। শিব মুচকি-মুচকি হাসেন। পার্বতী তা দেখে রেগে লাল।"

শুভ্র উৎসাহিত হয়ে বলে, "ভারী মজা তো। দেব-দেবীও কাঁদেন ? এসব তুমি কী করে জানলে ছোটকাকা ?"

"বইয়ে পড়েছি।" উত্তর দেন অমিতজ্যোতি।

শুভ্র এবার সামান্য ধাঁধায় পড়ে যায়। বলে, "খাওয়া-পরা নিয়ে বাবার সঙ্গে মা'র তো ঝগড়া হয় না। আমাকে আর তোমাকে নিয়েই যত ঝামেলা।"

অমিতজ্যোতি হেসে উত্তর দেন,"দূর বোকা ! ওকে কি ঝামেলা বলে।"

সৌরেনবাবু খবরের কাগজ ভাঁজ করে

শুভ্রর পড়ার ঘরে ঢুকে বলেন, "কিসের ঝামেলা রে অমু ?"

শুভ্র দেখতে পেল ছোটকাকা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সৌরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কী এত প্রাইভেট টক হচ্ছে শুনি ?" কেউই কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে বললেন, "আমি এসে তোদের প্রাইভেট ডিসকাশনে বাধা দিলাম তো ?"

শুভ্র এবার ছোটকাকার তোলা ছবিগুলো বাবাকে দেখাতে-দেখাতে বলল, "ছোটকাকা একজন আর্টিস্ট।"

সৌরেনবাবু রহস্য করে বললেন, "তাই নাকি ? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

"কেন ? গত বছর ছোটকাকা ফার্স্ট প্রাইজ পেলেন। কত ছবি আর প্রশংসা হল ছোটকাকার। আর বাড়িতেও তো কত হৈ-চৈ হল।" শুভ্র ছোটকাকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সৌরেনবাবু এবার হেসে ফেললেন ওর কথায়। বললেন, "আমারও তাই মনে হয়।" এবার ছোটকাকার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে অমু, একটা মুভি ক্যামেরার কী দাম রে ?"

শুভ্রর তর সইছিল না। বলল, "ছোটকাকাকে মুভি ক্যামেরা কিনে দেবে নাকি ?"

অমিতজ্যোতি এবার মুখ তুলে সৌরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কথাটা কদিন ধরেই তোমাকে বলব-বলব ভাবছিলাম। কিন্তু দামের কথা ভেবে সাহস পাইনি।"

শুভ্র অবাক হয়ে দেখল, বাবা ছোটকাকার একটা হাত ধরে ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, "আমাকেও তুই ভয় পাস অমু ? আমি কখনও ভাবতেই পারি না, তুই এমন ভুল করবি। ছবিগুলো সত্যিই সুন্দর হয়েছে। আমি চাই তুই আরো বড় হ। যখন যা লাগবে মুখ ফুটে বলিস। সাধ্যের মধ্যে হলে তোর আশা নিশ্চয়ই আমি পূরণ করব।" একটু থেমে চাপা গলায় বললেন, "এসব কথা যেন তোর বৌদির কানে না যায়। একেবারে পাকাপাকি কাজ করে তোর বৌদির মুভমেন্টের দু'চারখানা ছবি যদি তুলে ধরতে পারিস তো দেখবি কী কাণ্ড ঘটে যায় বাড়িতে।" কথাগুলো বলে সৌরেনবাবু ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

অমিতজ্যোতি বলেন, "দেখলি তো দাদাকে কেন আমি ভোলানাথ বলি।"

শুভ্রর গর্ব হচ্ছিল খুব। সারা মুখে হাসির ঢেউ। অমিতজ্যোতি বললেন, "দাদার কথার নড়চড় হবে না জানি। কিন্তু তোকেও আরও ভাল রেজাল্ট করতে হবে। হ্যাঁ রে, তোর তো আজ স্কুল ছুটি, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"দুপুরে বৌদি যখন ভাত-ঘুম দেবেন সে সময় ক্যামেরা কী করে হ্যাণ্ডেল করতে হয় শিখিয়ে দেব। মুভিটা পেয়ে গেলে ইয়াসিকাটা তোকেই আমি দিয়ে দেব।"

শুভ্র ক্যামেরাটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেল।

॥ ৩ ॥

আজ শুভ্রর জন্মদিন। মামিমা বিকেলে ফ্লুরি থেকে কেক নিয়ে আসবেন। ছাদে রঙ করে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। সব কিছু তদারক করছেন বড়মামা। নাড়ুগোপালের মতো চেহারা, টকটক করছে গায়ের রঙ। ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে একে দাবড়াচ্ছেন ওকে দাবড়াচ্ছেন। শুভ্র এর মধ্যেই বার-দুই ছোটকাকাকে বাবার ঘরে যেতে দেখেছে। প্রতিবারই দেখেছে, ছোটকাকার মুখে থৈ-থৈ হাসি। বাবা এত সবের মাঝেও বই পড়ছেন আর কী সব যেন নোট করছেন। মাকে মামিমা, মাসিমা, পিসিমার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে দেখেছিল। ছোটকাকাকেও এক সময় প্যান্ট শার্ট পরে বেলা এগারোটা নাগাদ

বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখল ও। একছুটে ছোটকাকার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "এখন কোথায় বেরুচ্ছ ?"

"ইস ! দিলি তো বাধা দিয়ে। একটা শুভ কাজে যাচ্ছিলাম।" উত্তর দিলেন অমিতজ্যোতি। শুভ্র গম্ভীর মুখ করে বলল, "তুমি না থাকলে একদম আমার ভাল লাগে না। এই বেরুচ্ছ ; কখন যে ফিরবে কে জানে !"

অমিতজ্যোতি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "আজকে আমি কি দেরি করতে পারি। দেখিস, ঠিক দুপুরের খাওয়ার আগেই আমি হাজির হয়ে গেছি। তোর বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করতে ভুলিসনি তো ?"

শুভ্র মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সকলকেই বলেছে। মুখ শুকনো করে বলে উঠল, "রজত বলছিল··· ।"

"কী বলছিল ?"

"উপহার কী পেলে আমি খুশি হই। ভীষণ লজ্জা করছিল। ও একটু পরে এসে জেনে যাবে বলেছে।" শুভ্র জানাল।

অমিতজ্যোতি সহাস্যে বললেন, "এতে লজ্জার কী আছে ? এখন তো এরকমই চলছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এরকমই বলে থাকে। টাকা খরচ করে উপহার দেবে, অথচ কাজে লাগবে না, এটা এখন আর কেউই চায় না। ঠিক আছে, আমি কাজটা সেরে আসি। ভয় নেই ; দেখবি ঠিক সময়ে আমি হাজির হয়ে গেছি।" কথা শেষ করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রজত এল মিনিট-দশেক পর। ওকে দেখে খুব খুশি শুভ্র। রজত জিজ্ঞেস করল, "কী ঠিক করলি ? তাড়াতাড়ি বল। বাবার বেরুবার আগেই বলে আসতে হবে। অফিস-ফেরত তোর পছন্দসই জিনিস নিয়ে আসতে পারবেন।"

শুভ্র একটুও ইতস্তত না করে বলল, "ফিল্ম।"

রজত হেসে বলল, "তুইও ক্যামেরাম্যান হবি নাকি ?"

শুভ্র উত্তর দিল, "ছোটকাকার মতো ক্যামেরাম্যান হতে পারলে ধন্য হয়ে যাব। ছোটকাকার তোলা লেটেস্ট ছবিগুলো দেখবি আয়।" রজতের হাত ধরে শুভ্র ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

রজত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "আমি এক্ষুনি আসছি। বাবাকে ফিল্মের কথা বলে আসি।"

রজতের বাবা অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার। খবরের কাগজে ওর বাবার কত ছবি বেরিয়েছে। রজত চলে যাওয়ার পর শুভ্র ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল। কেননা, বাবা এসব উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না। বড়দির বিয়ের সময়কার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বাবা বিয়ের চিঠিতে লিখেছিলেন, কোনোরূপ উপহার গ্রহণে আমরা অক্ষম। আপনাদের আশীর্বাদই একমাত্র কাম্য। এ-নিয়ে পিসিমা, মাসিমা কত কথাই না শুনিয়েছিলেন বাবাকে। বাবা শুধু হেসে বলেছিলেন, মেয়ে সুখী হোক এই তো প্রার্থনা করব সকলের কাছে। কত মান্যিগন্যি লোকের পায়ের ধুলো পড়বে আমার বাড়িতে। তাঁদের নেমন্তন্ন করে লোভীর মতো কে কী দিল এসব দেখা খুবই লজ্জার।

সুতরাং এ মুহূর্তে শুভ্র ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এই ভেবে যে, বাবা যদি জানতে পারেন যে, শুভ্র নিজে যেচে ফিল্ম চেয়েছে, তাহলে··· । সব আনন্দই যেন এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে বসল ওর। শুভ্র দেখল, এখন বাবা ব্যস্ততার সঙ্গে এঘর-ওঘর পায়চারি করছেন। মনে মনে ভাবল, বাবাকে না বললেই হল, এই রকম একটা ভাব নিয়ে ও রজতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রজত যেমন দৌড়ে গিয়েছিল ঠিক

তেমনি দৌড়েই ফিরে এসে বলল, "কই, ছবিগুলো কই ?"

শুভ্র এক এক করে ছবি বের করে রজতের হাতে দিতে লাগল। রজত অবাক চোখে সব কিছু দেখছিল। একটা ছবি হাতে নিয়ে বলল, "আরেব্বাস, এ কী ছবি রে ?"

ছবিটায় চোখ রাখল শুভ্র। একজন বয়স্ক মানুষের অজস্র আঁকিবুকিতে ভরা মুখের ছবি। প্রতিটি ভাঁজ কী স্পষ্ট ; কত জীবন্ত। রজত জিজ্ঞেস করল, "বুড়োর বয়স কত হবে রে ?"

শুভ্র গম্ভীর হয়ে একটু চিন্তা করে বলল, "আমার তো মনে হয় একশো পার করে দিয়েছে লোকটা।"

"এ—ক—শো ! বলিস কী রে ?"

শুভ্র বলল, "একশো না হলে কি মানুষের মুখে এত ভাঁজ পড়ে ?"

রজত বলল, "ছোটকাকার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিস বুঝি ?"

"নাহ্। এ-সবই আমার ধারণা।" শুভ্র উত্তর দিল।

রজত বলল, "এটা আমি নেব। রাশিয়ায় একজনের বয়স নাকি এখন একশো দশ।"

শুভ্র বলল, "তুই কী করে জানলি ?"

"সে কী রে। সংবাদটা তো খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। তুই দেখিসনি ? আশি-পঁচাশিজন নাতি-নাতনি লোকটার।"

কথাটা শুনে না হেসে পারল না শুভ্র। বলল, "মানুষটা খুব সুখী, তাই না রে ?"

রজত উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই। ক'জনের ভাগ্যে এমন ঘটে বল ? লোকটা নাকি আরো অনেকদিন বেঁচে থাকতে চায়।"

শুভ্র কল্পনায় লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল এবং অনায়াসে প্রাচীন মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল যেন। কী ভেবে বলল, "ও-দেশ থেকে কত মানুষই তো আসে এ-দেশে ; ও লোকটা যদি এ দেশে একবার আসত তো দেখতে পেতাম।" রজত ছবিগুলো অপলক দেখছে, দেখে বলল, "ছোটকাকা আসুক। তোর কথা বলব। নেগেটিভ যখন আছে, মনে হয় ছবিটা

ছোটকাকা তোকে দিয়েই দেবেন।"

রজতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে। বলল, "ঠিক চারটেতে চলে আসব।" চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তোর তো ক্যামেরা নেই, ফিল্ম দিয়ে কী করবি?"

শুভ্র উত্তর দিল, "ছোটকাকা আমাকে একটা ক্যামেরা প্রেজেন্ট করবেন বলেছেন। যদি পাই তো তোর দেওয়া ফিল্মগুলোকে কাজে লাগাব। প্রাণভরে ছবি তুলব।"

রজত অতশত বুঝল না। বেলা বাড়ছে দেখে আর দেরি করল না। রান্নার গন্ধে বাড়ি ম-ম করছিল। বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা শুভ্রকে আড়ে-আড়ে দেখছিল। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল। ছোটকাকা এখনও এলেন না দেখে মন-খারাপ হয়ে যাচ্ছিল শুভ্রর। কেননা, আর একটু পরেই মা সকলকে চানটান করে খেতে ডাকবেন। আর খাওয়ার সময় ছোটকাকা পাশে না থাকলে ওর পেটই ভরবে না। ও যখন এসব ভাবছিল, ঠিক সে-সময় অমিতজ্যোতি হৈ-হৈ করতে করতে বাড়ি ঢুকলেন। ছোটকাকার মুখভর্তি হাসি দেখতে পেল শুভ্র।

ও দৌড়ে কাছে আসতেই অমিতজ্যোতি ঘাড়ের ব্যাগ দেখিয়ে বললেন, "আজ তোর জন্মদিন। আর সবচেয়ে দামি উপহার আমার কপালেই জুটেছে।" ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বের করলেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "এটা লেটেস্ট ডিজাইনের মুভি ক্যামেরা। আজ সকলের সবকিছু এই ক্যামেরায় ধরে রাখব।"

শুভ্র নতুন ক্যামেরা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল। অমিতজ্যোতি বললেন, "ভেবেছিলাম, এ-ক্যামেরা দিয়ে তোর ছবি প্রথম তুলব। তা আর হল না। বৌদি দাদাকে কী নিয়ে যেন ধমকাচ্ছেন। কীরকম হাত পা নাড়ছেন দেখ। বউদির এই চেহারার ছবি প্রথম তুলে রাখি।" বলেই একমনে ছবি তুলতে লাগলেন। ছবি তোলার সময় এই প্রথম ক্যামেরার ভেতর

থেকে ক্রি-র-র ক্রি-র-র আওয়াজ শুনতে পেল।

শুভ্র বলল, "ইয়াসিকাটা আমাকে দেবে বলেছিলে, দেবে তো?"

"নিশ্চয়ই দেব। ছবি তোলার টেকনিক তো এর মধ্যেই অনেক কিছু শিখে গেছিস। বিকেলে কেক কাটার সময়ের ছবি আমিই তুলব, তার পরেরগুলো সব তোর। এই দ্যাখ, তোর জন্য তাই বেশি দামি ফিল্মও কিনে এনেছি।"

শুভ্র আজ থেকে একটা ক্যামেরার মালিক। এত খুশি যে কী করবে তা ভেবে পেল না। ওর সারা মুখে তখন হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। যেন একটা বিরাট রাজত্বের অধীশ্বর ও।

॥ ৪ ॥

শুভ্র ওর ছোটকাকাকে বলল, "তুমি খবরের কাগজে চাকরি করলে না কেন? কত ছবি তুলতে পারতে। সকলের মতো তোমার নামও ছবির শেষে ছাপা হত।"

অমিতজ্যোতি তার উত্তরে বললেন, "চাকরি আমি করব না ঠিক করেছি। বাঁধা মাইনের চাকরিতে একটা সুখ আছে ঠিকই, কিন্তু কী জানিস, চাকরি চাকরিই। স্বাধীনতা নেই। যখন যেখানে বলবে ছুটে যেতে হবে। ও-সব আমার ভাল লাগে না। দাদা-বৌদি থাকতে আমার কিসের দুঃখ।"

শুভ্রও মনে মনে ছোটকাকার কথাকে সমর্থন না করে পারে না। তবু অনেক সময় দেখেছে, হাত-খরচার জন্য, ফিল্মের জন্য ছোটকাকাকে বাবা-মা'র কাছে হাত পাততে হয়। ভাবনাটা গোপন রেখে জিজ্ঞেস করল, "ছবিগুলো কবে ওয়াশ করতে দেবে ছোটকাকা?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "দেব, দেব। ঘাবড়াসনি। আজ একটা ভাল অর্ডার পেয়েছি। পরশু মল্লিকবাড়ির ছেলের বিয়েতে ছবি তোলার কাজ। শ'-দুয়েক টাকা রোজগার হয়ে যাবে।"

শুভ্র বলল, "ওঁদের তো ক্যামেরা আছে। ওঁরাই তো ছবি তুলতে পারতেন।"

অমিতজ্যোতি হেসে বললেন, "বড়লোকের ব্যাপার আমরা কী বুঝি বল? নিজেরা ক্যামেরাম্যান হয়ে ছবি তোলা পছন্দ করে না। মিথ্যে আভিজাত্য,বুঝলি! আমাদের কাছে অতগুলো টাকা হলেও, ওদের কাছে ওসব হাতের ময়লা।" কথাগুলো শেষ করেই রহস্যময় ভঙ্গিতে শুভ্রর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলেন।

শুভ্র খুব সরল স্বভাবের ছেলে। ছোটকাকাকে ওরকম ভাবে হাসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অমন করে হাসছ কেন?"

অমিতজ্যোতি এবার শুভ্রকে ইশারায় আড়ালে আসতে বললেন। জমাট রহস্যের গন্ধ টের পেল শুভ্র। ও ছোটকাকার কথামতন একটু আড়ালে সরে দাঁড়াল। অমিতজ্যোতি নির্বিকার ভঙ্গিতে শুভ্রর কাছে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন, "ভাল করে দেখ।"

শুভ্র খামটা দেখেই বুঝতে পারল, ওতে কী আছে। মাকে প্রতি সপ্তাহেই এ-রকম ছোট খাম হাতে নিয়ে আসতে দেখেছে। একগাল হেসে বলল, "তুমিও এ-সবে বিশ্বাস করো?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "না, না। একদম বিশ্বাস করি না এসব। তবে কী জানিস, আজ তোর জন্মদিন, তার ওপর দাদার কৃপায় মুভি ক্যামেরা প্রাপ্তি। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতেই দোকানদার 'আসুন' 'আসুন' করতে লাগল। লোকটাকে দেখে কেমন যেন মায়া হল। ভাবলাম, এক টাকার একটা টিকিট কিনলে লোকটার যদি কোনো উপকার হয় তো হোক না। ক্ষতি কী!"

"বাবা বলেন, এসব এক ধরনের বাজে

নেশা। মানুষের হাত-পা আছে, চোখ আছে, বুদ্ধি আছে, কেন মানুষ এত ভাগ্যবিশ্বাসী হবে ? যাই বলো, আমি কিন্তু তোমার এই লটারির ব্যাপার সমর্থন করতে পারি না।" শুভ্র বেশ গম্ভীর হয়ে বলল কথাগুলো। অমিতজ্যোতি উত্তর দিলেন, "সে কি আমিই করি। বললাম না, লোকটাকে দেখে কেমন মায়া হল। লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার এখান থেকে কেউ কোনো পুরস্কার পেয়েছে ?' তো লোকটা দুঃখীর মতে মুখ করে বলল, 'না স্যার। জানেন স্যার, আমার দোকান থেকে যদি ফার্স্ট প্রাইজ ওঠে তো আমি বিক্রেতা হিসেবে বেশ কয়েক হাজার টাকা পাব। আর লোকজনও আমাকে খুব সৌভাগ্যবান ভাবতে শুরু করবে। একশো টাকার টিকিট বিক্রি করতে পারলে···।' কথা শেষ না করে গম্ভীর মুখে বলল লোকটা, 'কারখানায় কাজ করতাম স্যার। কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল বলেই না এ লাইনে নেমে পড়েছি।' এবার তুই বল শুভ্র, আমি কি ভুল করেছি ?" শুভ্র কোনো যুক্তিই যেন মানতে পারছিল না।

অমিতজ্যোতি অমনি বলে উঠলেন, "তুই সেদিন একজন ভিখিরিকে দশ পয়সা দিয়েছিলি। কেন দিয়েছিলি বল ?"

শুভ্র স্পষ্ট জবাব দিল, "আমার দশটা পয়সায় লোকটার যদি কোনো উপকার হয়—তাই ভেবেই দিয়েছিলাম।"

অমিতজ্যোতি হেসে বললেন, "বেগারি ইজ এ সোশ্যাল ইভিল"—এটা তুই-আমি সকলেই জানি। তবু আমরা গরিব-দুঃখীদের দু-চার পয়সা দিই। মানুষের কষ্ট আমরা সইতে পারি না বলেই দিই। থাকগে, আয় আমার সঙ্গে।"

শুভ্র কথা বাড়াল না। বাড়ির দক্ষিণদিকে ছোট সুন্দর একটা বাগান করেছেন ছোটকাকা। বাগানে নানান ধরনের ফুলের গাছ। জবাগাছে বেশ কয়েকটা ফুল ফুটেছে। নাইন-ও-ক্লক ফুলও ফুটেছে একঝাঁক। এরই মাঝে ছোটকাকা কুমড়োগাছও লাগিয়েছেন। বেশ তকতক করছে পাতাগুলো। দু-একটা চড়ুই কিচির-মিচির করে উড়ে উড়ে কী সব খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। আলসের ওপর একজোড়া পায়রা বকবকম করছে ঘাড় ফুলিয়ে। ছোটকাকা গাছের পাতায় হাত বুলোলেন, পাখির ডাক শুনলেন এক মনে। শুভ্রর দিকে চেয়ে বললেন, "ইয়াসিকাটা এক দৌড়ে নিয়ে আয় তো।"

শুভ্র এক দৌড়ে ক্যামেরাটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে ছোটকাকার কাছে এসে দাঁড়াল। নতুন-কেনা ফিল্ম ছোটকাকা ক্যামেরায় ভরে নিয়ে বললেন, "নে, ছবি তোল।" বিজয়ীর ভঙ্গিতে লটারির টিকিট বুকের কাছে ধরে হাসিমুখে পোজ দিলেন অমিতজ্যোতি।

ক্যামেরায় চোখ রেখে শুভ্র যখন অ্যাঙ্গেল ঠিক করছে সে-সময় ছোটকাকা বললেন, "আরও কাছে এগিয়ে আয়। খুব ক্লোজে ছবিটা তুলবি, বুঝলি !"

শুভ্র হেসে ফেলল সে কথায়। বলল, "তুমি এমন করছ যেন লটারিটা তুমিই পেয়েছ।"

"পাই না পাই বয়েই গেছে। সকলের ছবি তুলি, আমার ছবি কেউ তোলে না।"

শুভ্র বলল, "যেমন ঘরামির ঘর থাকে না।" বলেই হাসতে থাকেন। পাকা ক্যামেরাম্যানদের মতো মুখ-চোখ করে বলল, "রেডি। স্মাইল !"

অমিতজ্যোতি ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে হেসেই ফেলতেন। কিন্তু এখন হাসলে শুভ্র রাগ করতে পারে ভেবে ওর কথামতন হাসিমুখে পোজ দিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লিক-ক্লিক করে দুবার ক্যামেরায় শব্দ উঠল। শুভ্র বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ছোটকাকা।"

অমিতজ্যোতি জিজ্ঞেস করলেন, "দুটো

ফিল্ম নষ্ট করলি কেন ?"

শুভ্র অকপটে স্বীকার করল, "একটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো। দোকানে দেখেছি, দুবার ছবি তোলে !"

হঠাৎ অমিতজ্যোতি মুখ দিয়ে 'ইশ্' শব্দটা বের করলেন।

শুভ্র অবাক চোখে ছোটকাকার দিকে চেয়ে বলল, "ইশ্ করলে কেন ?"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বড্ড ভুল হয়েছে রে শুভ্র। দাদা-বৌদিকে সাক্ষী রেখে যদি তুলতে পারতাম। যাক, তোর তোলা ছবি দেখিয়ে দাদা-বৌদিকে খুব সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে, কী বলিস ?"

শুভ্র হ্যাঁ-না কোনো উত্তরই দিল না। কেননা, এ সময়, মা'র গলা শুনতে পেল শুভ্র। সকলকে খেতে ডাকছিলেন উনি। ঠিক চারটের সময় রজতও সেজেগুজে ওর ক্লিক ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে এ-বাড়িতে এল। নিপুণ ক্যামেরাম্যানদের মতো রজত কত রকমেরই না ছবি তুলল। সৌরেনবাবু রজতকে বললেন, "ফিল্মগুলো এখনই শেষ করে ফেলছ। ফাংশানের সময় তুললে পারতে ?"

রজত হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "মেসোমশাই, আপনার আমি দু-দুটো ছবি তুলেছি। আপনি যখন লেখায় ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়কার ছবি।"

সৌরেনবাবু সহাস্যে বললেন, "লুকিয়ে-লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত এসব করা হয়েছে। তা ভালই করেছ। অমু এত ছবি তোলে, কখনও আমার একটা ছবিও তুলল না। ওর সবকিছু শুভ্রকে নিয়ে। তোমার বাবা-মা আসবেন তো ?"

রজত উত্তর দিল, "মা আসবেন। বাবার কথা বলতে পারি না। পুলিশের চাকরি। আসার মুখেই হয়তো ক্রিং-ক্রিং ফোন বেজে উঠবে। কী, না অমুক জায়গায় মারামারি হচ্ছে, নয়তো ডাকাতির খবর।

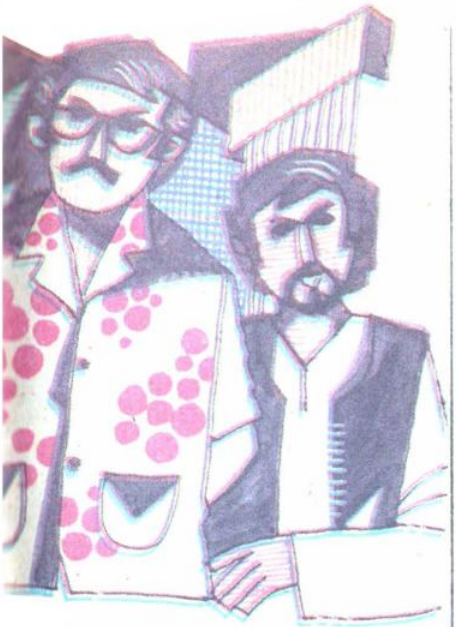

ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে পুলিশের পোশাক পরে ছুটতে হবে। মাঝরাতেও বাবাকে কত জায়গায় ছুটতে হয়।"

সৌরেনবাবু বললেন, "যত কষ্টই হোক, ওসব চাকরিতে প্রচণ্ড থ্রিল আছে। রিস্কও আছে খুব।"

শুভ্র এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল, "নো রিস্ক নো গেইন।"

সৌরেনবাবু বলেন, "জেনে রেখো এ গেইন পার্সোনাল গেইন নয়, রাষ্ট্রের গেইন। রাজীববাবুর মতো রেসপন্‌সিবল লোক যদি সব ডিপার্টমেণ্টে থাকত তো দেশের চেহারাই যেত পালটে। কেউ-ই এখন আর দেশের কথা ভাবে না।"

শুভ্রর মা এসময় ওদের কাছে এসে দাঁড়াতেই রজত বলল, "মাসিমা, আমার একটা আবদার আছে।"

"কী আবদার শুনি ?"

"শুভ্রর মাঝে আপনারা দুজন দুপাশে চটপট দাঁড়িয়ে পড়ুন তো।"

শুভ্র একটুও সময় নষ্ট করল না। বাবা-মায়ের মাঝখানে যখন দাঁড়িয়ে পড়েছে শুভ্র, ঠিক সেই সময় অমিতজ্যোতি জোর গলায় বলে উঠলেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান ফোটোগ্রাফারসাহেব। আমিও যাচ্ছি। ফ্যামিলির ফুল ছবিই তুমিই তোলো। দুটো শট নেবে। একটা ফসকে যেতে পারে।" বলেই আড়চোখে শুভ্রকে দেখে মুচকি হাসলেন অমিতজ্যোতি।

ছবি তোলার নামে শুভ্রর মা'র মুখে কী হাসি ! রজত বেশি সময় নষ্ট না করে আলো থাকতে থাকতে সকলের গ্রুপ ছবি তুলল। শুভ্রর মা বললেন, "ছবি তোলায় বড় কষ্ট। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়।"

সৌরেনবাবু বললেন, "তার মানে কী জানো। নিজেকে বেশি প্রমিনেণ্ট করার জন্যই তোমার অত কষ্ট হয়েছে।" বলেই হো-হো করে হাসলেন।

অমিতজ্যোতি বললেন, "মিছিমিছি বৌদিকে তুমি খোঁটা দিচ্ছ দাদা। তুমি মান্যিগন্যি লোক। কত ছবি উঠেছে তোমার। তাই ছবি তোলায় তোমারকোনো কষ্টই নেই।"

শুভ্রর মা ও-কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ ঠাকুরপো।"

অমিতজ্যোতি অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, "আমি সবসময় ঠিকই বলি বৌদি।"

॥ ৫ ॥

রোজ সকালে খবরের কাগজে অরণ্যদেবের কীর্তি-কাহিনী দেখার ভীষণ নেশা শুভ্রর। খবরের কাগজ খুলে ওটা দেখতে গিয়েই হঠাৎ রাজ্য-লটারির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। নম্বরটা মনে নেই। কিন্তু টিকিটটা ওরই কাছে রেখে দিয়েছেন ছোটকাকা। অরণ্যদেবে চোখ বুলিয়েই

একছুটে নিজের ঘরে ঢুকে ডেস্কের ভেতর থেকে লটারির খামটা বের করল শুভ্র। বাবা এ-সময় মর্নিং-ওয়াকে যান। ব্লাড শুগার হবার পর থেকেই রোজ হেদোয় আট-দশ পাক ঘুরে ঘামতে ঘামতে বাড়ি আসেন। নিশ্চিন্ত মনে লটারির টিকিট খুলে খবরের কাগজের পাশে চোখ রাখল শুভ্র। এ কী দেখছে সে! চোখ ঝাপসা, মাথাটাই বা ঘুরে গেল কেন? চোখ কচলে নিয়ে ফের নম্বর মেলাল শুভ্র। দেখল, টিকিটের নম্বরের সঙ্গে ফার্স্ট প্রাইজের নম্বরটার হুবহু মিল। বারবার দেখে নিয়ে শুভ্র হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "ছোটকাকা, ছোটকাকা" বলে।

প্রায় সাতটা বাজে। এ-সময় ছোটকাকার মাঝরাত। কিন্তু শুভ্রকে অমন চিৎকার-চেঁচামেচি করতে শুনে অমিতজ্যোতি চোখ খুললেন। ঘুম তখনও ওঁর চোখে আঠার মতো লেগে আছে। মা-ও ওর চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এত চেঁচাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?"

অমিতজ্যোতিও বড় করে হাই তুলে বললেন, "কী হয়েছে রে শুভ্র?"

শুভ্র ছোটকাকার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "নাউ ইউ আর এ রিচ ম্যান ছোটকাকা।"

অমিতজ্যোতি বললেন, "কবে আমি গরিব ছিলাম রে? খুলে বল কী হয়েছে?"

খবরের কাগজ আর টিকিটটা ছোটকাকার হাতে দিয়ে বলল শুভ্র, "দ্যাখো দ্যাখো,কী হয়েছে নিজের চোখেই দ্যাখো।"

শুভ্রর মা বললেন, "ঠাকুরপো বুঝি ফোটোগ্রাফিতে আবার একটা প্রাইজ পেল। একটা সার্টিফিকেটের কী দাম। ও রকম তো কতই পেয়েছে তোর ছোটকাকা।"

শুভ্রর কী হল, ও ঠিকঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিল না।

অমিতজ্যোতির চোখের ঘুম এতক্ষণে সরে গেছে। বললেন, "দেখি, দেখি! কাগজে কী বেরিয়েছে।" বার দুই-তিন লটারির নম্বরের সঙ্গে কাগজের ছাপা নম্বর মিলিয়ে দেখলেন। এরপর বিস্মিত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "ভুল ছাপা হয়নি তো?"

শুভ্রর মা বললেন, "কী হয়েছে খুলেই বলো না ঠাকুরপো!"

সব শুনে শুভ্রর মা কেঁদে ফেললেন।

শুভ্র অবাক চোখে মাকে দেখল শুধু। ছোটকাকা স্ট্যাচু হয়ে বসে ছিলেন তখন। ঘর্মাক্ত কলেবরে সৌরেনবাবু ঘরে ঢুকে ওদের সকলকে অমন অবস্থায় দেখতে পেয়ে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "হল কী সব?"

অমিতজ্যোতি খবরের কাগজ আর টিকিটটা সৌরেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলেন। "লটারির টিকিট!" নিজের মনেই কথাটা বলে খবরের কাগজের নম্বরের সঙ্গে টিকিটের নম্বর মিলিয়ে দেখলেন। ভুল দেখছেন না তো? ভাবলেন তিনি। এক সময় স্থির হয়ে বললেন, "ছাপার ভুল।" শুভ্রর দিকে চেয়ে বললেন, "যা তো,আর একটা কাগজ কিনে নিয়ে আয়।" শুভ্র পয়সা নিয়ে খবরের কাগজ কিনতে গেল। ওর পা দুটো ভীষণ ভারী ভারী ঠেকছিল। কিছুতেই ও যেন মোড়ের মাথার খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে যেতে পারছিল না। অনেক কষ্টে অন্য আর একটা খবরের কাগজ কিনে ও ধীর পায়ে বাড়ি ঢুকল।

নম্বরটা এবার সৌরেনবাবু নিজেই মেলালেন। তারপর এক সময় হো-হো করে হেসে বললেন, "এটাতেও তো একই নম্বর দেখছি।" অমিতজ্যোতির দিকে চেয়ে বললেন, "যেখান থেকে টিকিট কিনেছিলি সেখানে একবার খোঁজ কর। ওরা নিশ্চয়ই এর মধ্যেই লিখে দিয়েছে, প্রথম পুরস্কার আমাদের কাউন্টার হইতেই উঠিয়াছে।

প্রমাণপত্র দেখুন। যা যা দেরি করিসনি।"

শুভ্র দেখল, ছোটকাকা কেমন ভোম্বল-মুখ করে সকলের দিকে চেয়ে আছেন। এবার বেশ স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? এ প্রাইজ তুমিই পেয়েছ। হাত-মুখ ধুয়ে এসো, চা-টা খেয়ে একবার খোঁজ করিগে।"

অমিতজ্যোতির তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। বলেন, "ওসবের মধ্যে আমি নেই। আগামীকালই খবরের কাগজে বড়-বড় করে ভ্রম সংশোধন বেরুবে। দু-একটা দিন যাক। তারপর যা হয়, করা যাবে।"

ছোটকাকা যে এত নার্ভাস শুভ্র তা জানত না। ওঁর কথা বলা, ঢং-ঢাং দেখে শব্দ করে হেসে বলল, "প্রতি সপ্তাহেই তো একজন না একজন ফার্স্ট প্রাইজ পায়। তারা কি তোমার মতন করে?"

অমিতজ্যোতি উত্তর দেন, "কী জানি! লটারি-পাওয়া-লোক তো জীবনে দেখিনি।"

শুভ্র হেসে বলল, "আমি দেখেছি। এই যেমন তুমি। এখন তুমি দেড় লক্ষ টাকার মালিক।"

সৌরেনবাবু বললেন, "দেড় লক্ষ পাবে কী করে? ইনকামট্যাক্স কাটবে না?"

অমিতজ্যোতি এরই মধ্যে রসিকতা করে বলল, "এই নিয়ে আবার রচনা লিখতে বসিসনে যেন।" এ কথায় সকলেই হেসে ফেলল একযোগে।

মুখ-হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে একটু শান্ত হলেন অমিতজ্যোতি। শুভ্র বুঝল, এখন ছোটকাকাকে সামলানোর সব দায়িত্ব ওর। ভাবল, ছোটকাকাকে গার্ড করে চলতে হবে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি ওর মাথায় এসে গেল। একটুকরো কাগজে টিকিটের নম্বর লিখে পকেটে পুরে ফেলল। টিকিটটা মা'র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "টিকিটটা এখন আলমারির লকারে রেখে দাও তো।"

সৌরেনবাবু শুভ্রর কাণ্ডকীর্তি দেখে বেশ খুশি হলেন। "আজ আর অফিস যাচ্ছি না। একটা সকাল যে কাউকে এমন লাখপতি করে দিতে পারে ভাবতেই পারি না।" একটু থেমে অমিতজ্যোতির দিকে চেয়ে বললেন, "লোকে বলে ফাটকার টাকা বেশিদিন কেউ রাখতে পারে না।"

শুভ্র বলল, "অবিবেচক যারা, তারা কোনোদিনই কিছু করতে পারে ন। ছোটকাকা তো আর অবিবেচক নন যে, দু-হাতে টাকা ওড়াবেন।"

সৌরেনবাবু তবুও বললেন, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা উপার্জন করা যায় তার জন্য মানুষের দরদ থাকে বেশি। এসব আনআর্নড মানির খুব বেশি মূল্য নেই।"

শুভ্রর মা বললেন, "টাকা হাতে না আসতেই তুমি এমন করছ যেন ঠাকুরপো খুব দোষ করে ফেলেছেন।"

অমিতজ্যোতি এবার বললেন, "মুভি ক্যামেরা কিনে ফিরছি, এ-সময় লটারির দোকানের একজন 'আসুন, আসুন' করছিল। একে সেদিনটা ছিল শুভ্রর জন্মদিন, তার ওপর দামি ক্যামেরা প্রাপ্তি। লোকটাকে দেখে মায়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম, একটা তো মাত্র টাকা। কত পয়সাই তো এমনি নষ্ট করি। লোকটার কাছ থেকে টিকিট কিনলে ওর যদি কিছু উপকার হয়, এই ভেবেই—"

সৌরেনবাবু বললেন, "এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ওই দোকানে যা। টাকা হাতে পেলে লোকটাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াস।"

শুভ্রকে সঙ্গে করে অমিতজ্যোতি বেরিয়ে পড়লেন। শুভ্রর মা সত্যি-সত্যি টিকিটটা কপালে ছুঁইয়ে আলমারির লকারে রেখে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়েই শুভ্রর মনে হচ্ছিল, সকলেই যেন ওদের দেখছে। ছোটকাকার লটারি পাওয়ার খবর সকলেই বুঝি জেনেও গেছে এরই মধ্যে। ভীষণ

মজা লাগছিল এসব ভাবতে শুভ্রর।

অমিতজ্যোতি বললেন, "সত্যি যদি ভুল ছাপা হয় ?"

"খেপেছ। এসব কি কখনও ভুল হয়।" শুভ্র উত্তর দিল।

অমিতজ্যোতি বললেন, "দেখিসনি সরকারি গেজেট মিলিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।"

শুভ্র ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব লিখতে হয়, তাই লেখে।"

বলতে বলতে ওরা নির্দিষ্ট দোকানের কাছে এসে হাজির হয়ে গেল। দেখল, দোকানটাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। চোখে পড়ল, 'সুসংবাদ, সুসংবাদ। এই কাউণ্টার হইতে রাজ্য লটারির প্রথম পুরস্কার উঠিয়াছে।' টিকিটের নম্বরটাও বেশ বড় বড় করে লেখা।

একজনকে বলতে শুনল শুভ্র, "সেই ভাগ্যবানকে একবার দেখতে পেলে হত।"

আর একজন বলল, "দূর মশাই। সে কি আর আসবে। যা দিনকাল পড়েছে, লোক জানাজানি হলে কত রকমের বিপদ হতে পারে, জানেন ?"

আগেরজন বলল, "তা ঠিক। লটারিতে পাওয়া লাখটাকার লোক কখনও দেখিনি তো ?"

"দেখবেন কী করে। বড়লোকদের কি কখনও দেখতে পাওয়া যায় ?"

আর একজন বলল, "দেখুন গে, কোনো কোটিপতির ভাগ্যে এটা জুটেছে।"

"যা বলেছেন। যাদের আছে তারাই পায়, যাদের নেই তারা কোনোদিনই পায় না।"

প্রথম লোকটা বলল, "না মশাই, মাঝে মাঝে গরিব-দুঃখীও পেয়ে থাকে। এই তো কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল···।"

"ওসব খবরের কাগজের বানানো গল্প।"

"তা গল্পটা কী শুনি ?"

"একজন ঘন-ঘন লটারির টিকিট কিনত। উঠত না। ট্রেনে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। একজন ভিখিরি ভিক্ষে চাইতে এলে লোকটা ভিখিরিটাকে একটা লটারির টিকিট দিয়ে দিয়েছিল। আর কী আশ্চর্য ! সেই টিকিটেই নাকি ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছিল।"

"তা সেই লোকটা কি ভিখিরিটার কাছে গিয়েছিল ?"

"সে-সংবাদ কাগজে ছিল না।"

লোকজনের এ ধরনের কথা শুনতে পেয়ে শুভ্রর আনন্দ ধরে না। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, এই দেখুন ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া মানুষটা আপনাদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ও আবেগ সংবরণ করে ছোটকাকার দিয়ে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

ভিড় পাতলা হতেই শুভ্র ছোটকাকার হাত ধরে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছেন ?"

দোকানদারের মুখভর্তি হাসি। মাথা নেড়ে বলল, "খু-উ-ব ভাল।"

শুভ্র দেখল, দোকানে মা কালীর ফোটোয় টাটকা জবার মালা। একগুচ্ছ ধূপ জ্বলছে।

দোকানদার অমিতজ্যোতির মুখের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবল। কিছুই মনে করতে পারল না। অমিতজ্যোতি স্মিত হেসে বললেন, "এতদিনে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হল।"

দোকানদার খুব খুশি। মাথা নেড়ে বলল, "তা যা বলেছেন। এতদিনে মা প্রসন্না হলেন।"

অমিতজ্যোতি বললেন, "আপনি কত পাবেন ?"

দোকানদার বলল, "হাজার-কয়েক টাকা তো পাবই। পেলাম ভাল, না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। দোকানের গুডউইলটা তো বাড়ল। এই দেখুন না, সকালের মধ্যে পঞ্চাশখানা টিকিট বিক্রি করেছি। এখন থেকে সকলেই আমাকে পয়া দোকানদার ভাববে। যত বেশি টিকিট বিক্রি করতে পারব, কমিশনও তত বেশিই পাব। নেবেন নাকি একটা টিকিট ?"

শুভ্র বলল, "না।" একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, "ছাপায় ভুলটুল হয় না তো ?"

"না, না। এসব ব্যাপারে খুব সতর্কতা রক্ষা করা হয়।"

বেশি কথা না বাড়িয়ে শুভ্র ছোটকাকাকে সঙ্গে করে বাড়ির পথ ধরল। বাড়ি এসেই ও চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। বাবা অফিস না গিয়ে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন। জনে-জনে বলে বেড়িয়েছেন, ছোটকাকার ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার কথা। পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ছোটকাকাকে কনগ্রাচুলেশানস জানাতে এসেছে। অমিতজ্যোতিকে দেখে একজন প্রশ্ন করল, "এত টাকা দিয়ে কী করবেন ?"

আর একজন বলল, "টাকা ফিক্সড করে রেখে দেবেন মশাই। সুদেই জীবন কেটে যাবে।" রজতের কানেও কথাটা গিয়ে পৌঁছেছিল। ও ছুটতে ছুটতে এসে অভিমান করে শুভ্রকে বলল, "এত বড় একটা সংবাদ, আমাকেই তোর প্রথম জানানো উচিত ছিল।"

শুভ্র ভীষণ লজ্জা পেল এ-কথায়। অমিতজ্যোতি শুভ্র আর রজতকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। রজত বলল, "খবরটা এমন করে প্রচার করলি কেন ? চোর-ডাকাতরা ওই টিকিটটা নেবার জন্য হামলা না করে বসে। অবশ্য বাবা বলেছেন···।"

অমিতজ্যোতি বলেন, "কী বলেছেন তোমার বাবা ?"

রজত উত্তর দিল. "প্লেন ড্রেসে আর্মড পুলিশের ব্যবস্থা করবেন। তবে হ্যাঁ, এর

জন্য পুলিশের কাছে আপনাকে সাহায্যের আবেদন করতে হবে।"

শুভ্রর মুখ ভয়ে পাণ্ডুটে হয়ে গেল মুহূর্তে। বলল, "বাবাকে বলে এক্ষুনি চিঠি লিখিয়ে মেসোমশাইকে দিয়ে আসি, চলো। সাবধানের মার নেই।"

রজতও সেকথায় সম্মতি জানাল। বাবাকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে রজতকে সঙ্গে করে রজতের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল শুভ্র। রজতদের বাড়ির গেটের কাছে লাল-রঙা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এটা খুবই পরিচিত দৃশ্য। দুজন রাইফেলধারীও আছে জিপটায়।

রজত বলল, "যাক, বাবা এখনও বেরোননি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।"

এ-ব্যাপারে শুভ্রর থেকে রজতের উৎসাহই যেন বেশি। শুভ্রকে দেখে রজতের মা হেসে বললেন, "খুব মজা, না?" শুভ্র সুন্দর ভঙ্গিতে হাসল শুধু।

রজত জিজ্ঞেস করল, "বাবা কোথায় মা?"

"কেন? হঠাৎ বাবাকে খুঁজছিস যে।"

রজত ভারিক্কি চালে বলল, "ও তুমি বুঝবে না।" বলেই শুভ্রকে সঙ্গে করে ভেতরের ঘরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে শুভ্র দেখল ফুল ইউনিফর্ম পরে রজতের বাবা ফোনে গম্ভীর গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ওদের দেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতের ইশারায় বসতে বলে ফোনে কথা বলছিলেন। ফোন নামিয়ে রেখে রজতের বাবা রাজীববাবু শুভ্রকে দেখে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, "অতগুলো টাকা দিয়ে ছোটকাকা কী করবেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছ?"

শুভ্র উত্তর দিল, "এখনও সেসব কিছুই ভাবিনি।"

ওর কথা শেষ হতেই রজত বলল, "জানো বাবা। শুভ্রদের বাড়িতে কত লোক আসছে।"

"তা তো আসবেই। কিন্তু তোমরা হঠাৎ এখানে কেন?"

শুভ্র উত্তর দিল, "রজত বলছিল, এর মধ্যে অনেক লোকই নানান মতলবে আসছে। হয়তো এদের মধ্যে ডাকাত-টাকাতও থাকতে পারে।"

রাজীববাবু মুচকি হেসে বললেন, "তাই নাকি? গোয়েন্দা বই পড়ে তোমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে দেখছি।"

রজত ধীরস্থির ভাবেই উত্তর দিল, "এখন তো দিনে-দুপুরে কত রকমের ডাকাতিই না হচ্ছে। হয়তো, টিকিটটার লোভে, ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসতে পারে। তাই তোমাকে বলতে এসেছি। মেসোমশাই এই চিঠিটা তোমাকে দিয়েছেন।"

রাজীববাবু চিঠিটা পড়ে পুলিশি কায়দায় বললেন, "ঠিক আছে, আমি সবরকম প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করব। তোমরা কিন্তু স্বাভাবিকই থাকবে। কাউকে কিছুই বুঝতে দেবে না। বুঝলে?" এই পর্যন্ত বলে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রজতের মা'র মুখোমুখি হতেই খুক-খুক করে হেসে বললেন, "ছেলে তোমার বড় হয়ে শার্লক হোমস হবে।" জুতোয় শব্দ তুলে রাজীববাবু ঋজু ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন।

ওদের দুজনের অমন চিন্তান্বিত মুখ দেখে রজতের মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

॥ ৬ ॥

সারাটা দিন যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারল না শুভ্র। ঢং ঢং করে আটটা বাজার শব্দ হল। সৌরেনবাবু বললেন, "এখন একটু চা কিংবা কফি হলে মন্দ হত না, কী বলিস অমু?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "ভালই হত।

তবে বৌদির যা ধকল গেল আজ সারা দিন।"

শুভ্রর মা বললেন, "উঃ, কী দরদ! ঠিক আছে বোসো। তবে একটা কথা তোমাকে বলছি ঠাকুরপো, লটারি নিয়ে কতদিন যে তোমার অ্যাসিসট্যান্টের লেখাপড়া শিকেয় উঠবে জানি না।"

শুভ্রর ভীষণ রাগ হল একথা শুনে। মা যে কী! কেবল পড়া আর পড়া। দু-একদিন না পড়লে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। কথাগুলো ভাবলেও, মুখে প্রকাশ করল না শুভ্র। অমিতজ্যোতি গম্ভীর গলায় বললেন, "শুভ্র, চটপট আজকের দিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা লেখ তো। ভাল হলে, ইউ উইল বি অ্যাওয়ার্ডেড। যা।"

শুভ্র বুঝল, এখন আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেবিলের ওপর একটা ডাইরি দেখতে পেয়ে ওর বিস্ময় গেল বেড়ে। ডাইরিটা ছোটকাকার এটা বুঝতে পারল শুভ্র। কৌতূহলী হয়ে ও ডাইরির পাতা ওলটাতে লাগল। ও জানে অন্যের ডাইরি বা চিঠি পড়তে নেই। অন্যায় হলেও ডাইরিটা না খুলে পারল না। ছোটকাকার সুন্দর হাতের লেখার কিছু অংশ ও পড়ে ফেলল। লেখা ছিল: ভালমতন একটা স্টুডিও খোলার বড় সাধ। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে যে অনেক ব্যবধান। কতদিন আর দাদা-বৌদির কাছে হাত পাতা যায়। ভাল ফোটোগ্রাফারের কদর এ-দেশ এখনও দিতে শিখল না। ছোটকাকার এই লেখার অংশটুকু পড়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল শুভ্রর মন। এরপর ডাইরির আর কয়েকটা পাতা ওলটাতেই ও ভীষণরকম হোঁচট খেল। ভাবল, ছোটকাকা মুখে যতই ভাগ্যকে অস্বীকার করুন, গোপনে গোপনে লটারির টিকিট কিনতেন। অনেকবারই লটারির টিকিট কিনেছেন এবং সেসব টিকিটের নম্বরগুলোও ডাইরিতে লিখে রেখেছেন। এবারের টিকিটের নম্বরও ডাইরিতে লেখা আছে। শুভ্র ছোটকাকার এই গোপন রহস্য আবিষ্কার করে মনে মনে ভীষণ খুশি হল। ভাবল, নিরিবিলিতে ছোটকাকাকে সব জানিয়ে একেবারে চমকে দেবে। কিন্তু ডাইরিটা ছোটকাকা এখানে রাখলেন কেন? একটা ক্লু চটপট বের করে ফেলল শুভ্র। তা হচ্ছে, সবার আড়ালে ছোটকাকা ডাইরিতে এ টিকিটের নম্বর লেখা আছে কিনা দেখে উত্তেজনার বশে নিজের ঘরে ডাইরিটা না রেখে ওর ঘরে রেখে গেছেন।

শুভ্র এসব ভাবনা ভেবে নিয়ে একমনে আজকের দিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা গুছিয়ে গুছিয়ে লিখতে শুরু করল। প্রায় চার পাতা একটানা লিখে ফেলল শুভ্র। লেখাটা পড়ে নিজেরই বেশ ভাল লাগল। লেখাটা আগাগোড়া রিভিশান দিয়ে শুভ্র শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। এরপর ও ছোটকাকাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় ডাকল।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দু-চারটে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও সারা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অমিতজ্যোতিরও খুব বেশি দাদার সামনে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সৌরেনবাবুর থেকে আট বছরের ছোট, ওঁর রাশভারী কথাবার্তার সামনে অমিতজ্যোতি মিয়োনো মুড়ির মতো হয়ে পড়েন।

অমিতজ্যোতি বললেন, "লেখা হল?"

"হ্যাঁ। এসো, দেখবে এসো।"

অস্বস্তির খাঁচা থেকে মুক্তি পেলেন যেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "যাচ্ছি দাঁড়া।"

সৌরেনবাবু ওঁকে উঠতে দেখেই বললেন, "শুভ্র যাই লিখুক, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবি না। মাঝে-মাঝে দু-একটা বিষয় নিয়ে—যেমন বাক্যবিন্যাস, ক্রিয়াপদের ব্যবহার, ভাষা এসবের কথা বলবি। বুঝলি? একেবারে নির্ভেজাল প্রশংসায় ওবয়সের ছেলেদের মাথা বিগড়ে যায়।"

ফেনা আর ফেনা
টাট্‌কা তাজা...
স্বাস্থ্যে ভরপূর !

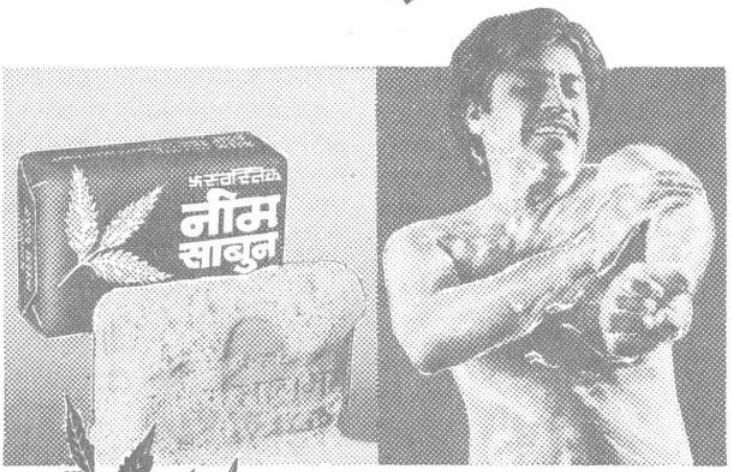

স্বস্তিক

নিম সাবান

নিম আর কর্পূরে মিলিয়ে তৈয়ার
তাইতো স্নানের মজা, ফূর্তির জোয়ার !

shilpi dm 5A/83 ben

অমিতজ্যোতি মাথা নাড়লেন শুধু। সে মাথা নাড়ার কী অর্থ ঠিক বোঝা গেল না। সামান্য একটু দ্রুততার সঙ্গে শুভ্রর পড়ার ঘরে চলে এলেন। শুভ্র বাধ্য ছেলের মতো রচনার খাতাটা ছোটকাকার সামনে তুলে ধরতেই, অমিতজ্যোতি বললেন, "দাঁড়া বাপু। একটু জিরিয়ে নিই। উঃ, দাদার সামনে বসে থাকাটা যে কী পানিশমেন্ট!"

শুভ্র মুচকি হেসে বলল, "বাবা যে কী করে মাঝে-মাঝে হাসির গল্প লেখেন, বুঝি না।" অমিতজ্যোতি আড়চোখে শুভ্রকে দেখে নিয়ে বললেন, "অধিকাংশ হাসির লেখকরাই ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির, তা জানিস?" বড় করে হাই তুললেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "দেখি তো কী লিখেছিস?"

শুভ্র উত্তর দিল, "খাতাটা তো তোমার হাতেই রয়েছে।"

"তাই তো।" অমিতজ্যোতি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "টাকাগুলো হাতে পেলে এবার পুজোয় রোটাং পাস যাব ভাবছি।"

শুভ্র জিজ্ঞেস করল, "রোটাং পাস! খাইবার পাসের নাম শুনেছি। ও নাম তো শুনিনি। রোটাং পাস কোথায় ছোটকাকা?"

"মানালি হয়ে যেতে হয়। একবার আমি গিয়েছিলাম। বরফঢাকা চারপাশের পাহাড়গুলোর কী সৌন্দর্য তা তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। দাদা-বৌদিও তো কোথাও কোনোদিন বেরোননি। দাদার শুধু পড়াশুনো আর বৌদির সংসার। ধ্যুত! রজতকেও সঙ্গে নেব ভাবছি।"

শুভ্র অবাক চোখে ছোটকাকাকে দেখছিল। ভাবল, ছোটকাকা সকলের জন্য কত ভাবেন। টাকা নেই বলে সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারেন না। এবার মনের সাধে সব মেটাতে পারবেন।

অমিতজ্যোতি বললেন, "সব ঠিকঠাক করে তবেই সকলকে বলব। তুইও কাউকে বলিসনি যেন।" এবার শুভ্রর লেখা মন দিয়ে পড়তে লাগলেন।

শুভ্র কী মনে করে 'ছোটকাকার' ডাইরিটা তুলে ধরে বলল, "প্রাইজের কথায় তোমার সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে ছোটকাকা। এত ইমপর্ট্যান্ট ডাইরিটাও ঠিক জায়গায় রাখতে ভুলে গেছ।"

অমিতজ্যোতি ছোঁ মেরে ডাইরিটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললেন, "আমাদের মতন চুনোপুঁটিদের ডাইরির আবার কী ইমপর্ট্যান্স!"

শুভ্র গম্ভীর গলা করে বলল, "ইউ আর এ লায়ার ছোটকাকা।"

"লায়ার! আমি!"

"হ্যাঁ তুমি। এর আগেও কত টিকিট কিনেছ। আর মুখে বলো ভাগ্যটাগ্য তুমি একদম বিশ্বাস করো না। আর সেদিন বললে, লোকটার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে একটা টিকিট কিনেছ। টাকা থাকলে তুমি কী করতে তাও আমি জেনে গেছি।"

হো-হো করে হেসে ফেললেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "আমি যদি লায়ার হই দেন ইউ আর এ থিফ। অন্যের ডাইরি আর চিঠি পড়া অন্যায় তা নিশ্চয়ই জানিস?"

শুভ্র শুকনো মুখে মাথা নিচু করে রইল। অস্ফুটে বলল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে ছোটকাকা। এরকম আর কখনও হবে না।"

অমিতজ্যোতি জল হয়ে গেলেন একেবারে। বললেন, "দূর বোকা। আমি কিছুই মনে করিনি। তবে হ্যাঁ, তোর আর আমার অন্যায় দুয়ে মিলে কাটান হয়ে গেল।" কথা শেষ করেই রচনায় মন দিলেন। সবটা পড়ে মন্তব্য করলেন, "ভালই হয়েছে। তবে উপসংহারটা বড় বই-ঘেঁষা হয়ে গেছে। যা, দাদাকে লেখাটা

দেখিয়ে আয়।"

শুভ্র বলল, "তুমি কী ছোটকাকা। একেবারে সিংহের মুখে ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে?" আবারও শব্দ করে হাসলেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "দাদা সিংহ ঠিকই তবে বেশিমাত্রায় অহিংসক সিংহ। মানুষটা কখনও কাউকে দুঃখ দেননি, আঘাত করেননি। তুই সিংহ বলছিস, আমি বলি দাদা হচ্ছেন নীলকণ্ঠ।"

শুভ্রর চোখের সামনে শিবের নীলকণ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটা মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও আর কথা বাড়াল না। ছোটকাকার কথামতো রচনার খাতাটা সঙ্গে নিয়ে ধীর পায়ে বাবার দিকে এগিয়ে গেল।

শুভ্র বলল, "ছোটকাকা লেখাটা তোমাকে দেখতে বলেছেন।"

সৌরেনবাবু চশমা চোখে দিয়ে রচনাটা একমনে পড়ে বললেন, "বোস।"

শুভ্র ভয়ে-ভয়ে পাশের চেয়ারটায় বসতেই সৌরেনবাবু বললেন, "বেশ হয়েছে। আমি পরীক্ষক হলে সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস দিতুম, তা অমু কী বলল?"

"ভালই তো বললেন। তবে উপসংহারটা নাকি···।"

"ঠিক। ঠিক বলেছে অমু। আমার মনে হয়, এটা চেষ্টা করে ঠিক করে ফেলতে পারবি।"

ঢং-ঢং করে ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দ হল।

শুভ্রর মা বললেন, "এবার হাত-মুখ ধুয়ে খেতে এসো সকলে।"

॥ ৭ ॥

ছোটকাকার দেওয়া ইয়াসিকা ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছিল শুভ্র। জন্মদিনে পাওয়া রজতের উপহারের কথা মনে পড়তেই ও ড্রয়ার খুলে নতুন ফিল্ম বের করে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে ঘুরোতে-ঘুরোতে এক নম্বরে এনে দাঁড় করাল। ভাবল, ছোটকাকার সহাস্য মুখের ছবি ও তুলবে প্রথমে। তারপর বাড়ির আর সকলের। এইসব যখন ভাবছিল, তখন স্মার্ট চেহারার সুবেশ এক ভদ্রলোককে অ্যাটাচি কেস নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখল। লোকটাকে ও এর আগে আর কখনও দেখেনি। এমনকী পাড়াতেও না। কিন্তু এরকম সময়ে কোনোদিনই বাড়িতে অপরিচিত কাউকে আসতে দেখেনি। বাবার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁরা এত ভোরে কখনও আসেন না। বাড়িটাকে লোকটা এমনভাবে নজর করছিল যে, শুভ্রর তা মোটেই ভাল লাগল না। দোতলার বারান্দায় নিজেকে যতটা পারল আড়াল করল শুভ্র। লোকটা কাছাকাছি আসতেই কী মনে করে ক্যামেরায় চোখ রেখে ক্লিক করে শাটার টিপে দিল। এবার এক নম্বর থেকে দু নম্বরে ফিল্ম ঘুরিয়ে আনল। ক্যামেরাটাকে সন্তর্পণে টেবিলের ওপর রেখে ও নীচে নেমে আসতেই দেখল, ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন।

শুভ্রকে দেখে বললেন, "হাই।"

ওদের বাড়িতে এ ধরনের কথার চল নেই একদম। ও কিন্তু জানে এসব সময় কী বলা উচিত; কেমন কায়দায় উত্তর দিতে হয়। বাঙালিয়ানা প্রগাঢ় হয়ে উঠল এ সময় শুভ্রর। ও একটু অবাক চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "তুমিই তো শুভ্রপ্রকাশ রায়, তাই না? ওই নামী স্কুলের ক্লাস টেনের সেকেণ্ড বয়।" বলেই শুভ্রর উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন।

শুভ্র ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।" বলেই ভাবল, কালই তো বাবা ছোটকাকাকে বলছিলেন, দেখিস টাকার গন্ধ পেয়েছে তো লোকে; বিশেষ করে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট, গাড়ি-বাড়ির দালালরা এবার ঘন-ঘন আসবে। ভদ্রলোক কী প্রকৃতির হতে পারেন, ভাবছিল শুভ্র।

ভদ্রলোক এবার গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "অমিতজ্যোতি রায় তোমার কাকা, তাই না ?"

"হ্যাঁ, ছোটকাকা।"

"উনি তো ফোটোগ্রাফার। অনেক প্রাইজ-ট্রাইজও পেয়েছেন।"

ঋজু ভঙ্গিতে শুভ্রও উত্তর দিল, "আপনি তো সবই জানেন দেখছি।"

ভদ্রলোক হেসে শুভ্রর কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, "আমাদের সব জানতে হয়।"

শুভ্র বলল, "এসব তো পুলিশের কাজ। আপনি কি পুলিশে কাজ করেন ?"

"পুলিশের ব্যাপার তুমি জানলে কী করে ?"

"কেন জানব না। ডিটেকটিভ বইয়ে লেখা থাকে।"

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে বললেন, "আমাদের দেশে যাঁরা ডিটেকটিভ বই লেখেন তাঁরা ডিটেকশানের কিছুই জানেন না। ইংরেজি বইয়ের কায়দায় মনগড়া যত্ত সব বাজারি বই লেখেন। একেবারে ট্রাশ।"

ভদ্রলোকের কথা বলার মাঝে কেমন একধরনের সবজান্তা ভাব। ওঁর কথাবার্তা একদম ভাল লাগছিল না শুভ্রর।

শুভ্র প্রশ্ন করল, "আপনি কার জন্য এসেছেন, বললেন না তো ?"

অ্যাটাচিকেসটাকে দুপায়ের ফাঁকে রেখে ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমার ওই এক দোষ। কারো সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে আসল কাজটাই ভুলে যাই। আসলে কী জানো, তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগছিল। আমি এসেছি তোমার কাকার সঙ্গে কথা বলতে। ওঁকে একটু ডেকে দাও। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে, রাঘব দত্ত।"

শুভ্র বলল, "আপনি একটু বসুন। ছোটকাকার ঘুম ভাঙে আটটার পর। এখন ডাকলে হয়তো রাগ করতে পারেন।"

রাঘব দত্ত সহাস্যে বললেন, "তাও জানি। আর্টিস্টরা সাধারণত একটু লেট-রাইজারই হয়ে থাকেন। রাত জেগে কাজ করতে হয়তো। ডোন্ট ওরি ; আমি অপেক্ষা করতে পারি। মিছিমিছি ওঁকে কষ্ট দিও না।"

শুভ্র কিন্তু এবার একটু খুশি হল। ছোটকাকাকে ভদ্রলোক আর্টিস্ট বলেছেন। এরকম সম্মান করে কথা বলতে ও কাউকে শোনেনি।

বসার ঘরে চেয়ার দেখিয়ে শুভ্র বলল, "বসুন তাহলে। দেখছি কী করতে পারি।"

ভদ্রলোক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় সিগারেটের টুকরোটাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। শুভ্র অবাক চোখে রাঘব দত্তর কৌশল দেখে নিল।

দেরি না করে ও ছোটকাকার ঘরে ঢুকে দেখে ছোটকাকা ধনুকের মতো বেঁকে শুয়ে আছেন। গায়ে একটা পাতলা চাদরও রয়েছে। জ্বর হয়নি তো—ভাবল শুভ্র। সন্তর্পণে ছোটকাকার কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখল, জ্বর নেই।

"ছোটকাকা, তোমাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন।" শুভ্র অমিতজ্যোতির কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীরে ধীরে বলল।

অমিতজ্যোতি হকচকিয়ে উঠে বসে শুভ্রর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কে এসেছে ? প্রেসের লোক বুঝি ? প্রেসের লোকরা কী করে যে খবর পায় বুঝি না।"

শুভ্র বলল, "হতে পারে। নাম বললেন, রাঘব দত্ত।"

অমিতজ্যোতি কিছুক্ষণ নামটা মনে করার চেষ্টা করলেন। শুভ্র কোন ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দোতলায় গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ক্যামেরাটা সঙ্গে করে বেড়াল-পায়ে নীচে নেমে রাঘব দত্তর পেছন থেকেই ছবি তুলল। তিন নম্বর ফিল্ম ঠিক করে ও ফের দোতলায় উঠে ক্যামেরা টেবিলে রেখে নীচে নেমে এল। ফের ছোটকাকার ঘরে গিয়ে দেখল, ছোটকাকা

বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁতকে সারাজীবন সুরক্ষা দিন।

বিনাকা ফ্লোরাইড-এ সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড থাকে। যা আসলে দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে আপনার দাঁত আরও মজবুত করে। সারাজীবন দন্তছিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ঐ সুরক্ষা-ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। সবসময় বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়েই দাঁত মাজুন। এটি আপনি যত বেশী ব্যবহার করবেন, আপনার দাঁতের আয়ুও তত বেশী বাড়বে।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে।

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-BF-2-82 BN.

ঘুমোচ্ছেন নাক ডাকিয়ে।

শুভ্রর খারাপ লাগছিল। এবার ও একটু জোর গলাতেই ডাকল, "ছোটকাকা, ভদ্রলোক কখন থেকে বসে আছেন, দেখা করতে পারছ না?"

লাজুক মুখে অমিতজ্যোতি বললেন, "ভেরি সরি। পারিস তো বৌদির কাছ থেকে এক কাপ চা নিয়ে ভদ্রলোককে দিয়ে আয়। মুখ-হাত ধুয়ে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

শুভ্র উত্তর দিল, "ফের তো তোমার জন্য আমাকে চা আনতে হবে। তার চেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলো না। তখন দুজনের জন্যই না হয় চা নিয়ে যাব।"

অমিতজ্যোতি বুঝলেন, আর শুয়ে থাকার উপায় নেই। বড় করে হাই তুলে, শরীরে আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নামলেন। মিনিট-পনেরোর মধ্যে সব কাজ সেরে বসার ঘরে চলে এলেন। শুভ্র ক্যামেরা ঠিক করেই রেখেছিল। রাঘব দত্ত হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াতেই অমিতজ্যোতিও হাত বাড়িয়ে দিলেন। শুভ্র ওঁদের করমর্দনের ছবি তুলে নিল চট করে। ও সময়টা আন্দাজ করেই বুঝল এবার বাবা মর্নিং-ওয়াক থেকে ফিরবেন। সুতরাং সতর্ক হয়ে ও পড়ার ঘরে চলে গেল। একটু পরেই সৌরেনবাবুর গলা শুনতে পেয়ে শুভ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেননা, ওর মন পড়েছিল বৈঠকখানার ঘরে। ভাবল, ওখানে এতক্ষণ কী যে ঘটে যাচ্ছে কে জানে। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে ও নীচে নেমে এল। এসেই দেখল বৈঠকখানার ঘরের একটা পাট ভেজানো। সামান্য উঁকি মারতেই ও ভেতরের সব কিছু দেখতে পেল।

রাঘব দত্তর দু-একটা কথাও যে ওর কানে গেল না তা নয়। রাঘব দত্ত বলছিলেন, "এই সামান্য রিস্কটুকু তো আপনাকে নিতেই হবে। দেখুন মশাই খাটনির সব টাকাই তো প্রায় গভর্নমেণ্ট ট্যাক্স হিসেবে কেটে নেয়, যত ঝঞ্ঝাট আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের নিয়ে। পারে, বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ছুঁতে?"

অমিতজ্যোতি উত্তরে বললেন, "তা ঠিক। আমাকে ভাববার একদিন সময় দিন।"

রাঘব দত্ত বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা কেন? আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় নিন না। আজ তাহলে আসি। বি কেয়ারফুল মিঃ রায়। এসব কথা স্ত্রীকেও বলবেন না।"

অমিতজ্যোতি সরল ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "সে ভয় নেই। আমি বিয়েই করিনি।"

রাঘব দত্ত উঠে দাঁড়াতেই ওঁর প্রোফাইলটা সুন্দর ধরা পড়ল শুভ্রর চোখে। ও সময় নষ্ট না করে চার নম্বর ছবি তুলে নিল

অমিতজ্যোতি বললেন, "দাঁড়ান মিঃ দত্ত। টিকিটটা স্বচক্ষে একবার দেখে যান।"

কথাটা কানে যেতেই শুভ্র দ্রুত সরে গেল। পড়ার ঘরে মনোযোগী ছাত্রের মতো বসে রইল। ছোটকাকার পায়ের শব্দ ওর কানে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারল, ছোটকাকা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে মা-র সঙ্গে ছোটকাকার কী কথা হয় তা জানার জন্য ও মিছিমিছি রান্নাঘরে এসে মাকে বলল, "আজ আর টিফিন দিতে হবে না। আজ আমাদের হাফ ছুটি।"

মা বললেন, "কথাটা আগে বললেই পারতিস। টিফিন তো করা হয়ে গেছে। বাড়ি এসে খেয়ে নিস।"

শুভ্র জিজ্ঞেস করল, "ছোটকাকা এসেছিলেন মনে হয়? কোথায় গেলেন?"

"আলমারির চাবি নিয়ে গেল। কী যেন দরকার।"

শুভ্রর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কেননা, আলমারিতেই তো ছোটকাকার দেড় লক্ষ টাকার প্রাইজের টিকিটটা রয়েছে। ও সময়

নষ্ট না করে পড়ার ঘর থেকে ক্যামেরা নিয়েই যে ঘরে আলমারি থাকে সে ঘরের দরজার কাছে এসে অবাক হয়ে গেল বড় বেশি। দেখল, ছোটকাকা লটারির টিকিট বের করে টিকিটটার দিকে অপলকে চেয়ে আছেন। শুভ্র ছোটকাকার অমন ভঙ্গির ছবি তুলে সরে পড়ল। রিল ঘুরিয়ে ছ'নম্বরে ফিল্ম নিয়ে এসে ওঁত পেতে বসে রইল, ছোটকাকা কখন নীচে নামেন। আলমারি বন্ধ করে অমিতজ্যোতি নীচে নেমে গেলেন। ও-ও ছোটকাকাকে অনুসরণ করল খুব সতর্ক ভঙ্গিতে।

দরজা অর্ধেক খোলা রেখে ছোটকাকা সহাস্যে রাঘব দত্তর দিকে চেয়ে বললেন, "দেখুন। এই একটুকরো কাগজ আমাদের কত চিন্তায় ফেলেছে।" ছোটকাকা টিকিটটা রাঘব দত্তর দিকে এগিয়ে দিলেন। রাঘব দত্ত হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিতেই ছ'নম্বর ছবি তুলে ফেলল শুভ্র।

টিকিটটার দিকে রাঘব দত্ত লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শুভ্র দেখল, ছোটকাকা রাঘব দত্তর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ও সাত নম্বর ছবি তুলে নিয়ে ওঁরা দুজন কী করেন তা দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

রাঘব দত্ত বাঁহাতে টিকিটটা রেখে ডান হাত দিয়ে অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেললেন। রাঘব দত্ত অ্যাটাচির ভেতর থেকে গোছা গোছা টাকার বাণ্ডিল বের করে অমিতজ্যোতির চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, "সময় নষ্ট করে লাভ কী ? যা করার এক্ষুনি করে ফেললে হয় না ?"

শুভ্র দেখল ছোটকাকার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। লোভী দৃষ্টিতে টাকাগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "তবু একটা দিন আমাকে ভাববার সময় দিন।"

"দূর মশাই। আপনাকে দিয়ে কিস্যু হবে না। ট্যাক্স কেটে হাতে কত পাবেন জানেন ? সাতানব্বুই কি আটানব্বুই হাজার টাকা। আমি আপনাকে দেড় লাখ টাকাই দিচ্ছি। একটু রিস্ক নিতে পারছেন না ? কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। সাধ মিটিয়ে জীবনটাকে এনজয় করতে পারবেন।" রাঘব দত্ত একটানা কথাগুলো বলে চেয়ে রইলেন অমিতজ্যোতির দিকে। বলেই টাকার বাণ্ডিল থরে থরে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

শুভ্র আট নম্বর ছবি তুলে ফেলল। অমিতজ্যোতি ঠিক আগের মতো গলা করেই বললেন, "সবই বুঝলাম। কিন্তু কী জানেন, এসব করতে গিয়ে ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়ি তাই ভাবছি।"

রাঘব দত্ত বললেন, "কেউ-ই কিছু করতে পারবে না। বুদ্ধিমানের মতো চললে জীবনটা আপনার অন্য খাতে বইতে থাকবে দেখবেন। টিকিটটা পকেটে রাখতে যাচ্ছে দেখে অমিতজ্যোতি বললেন, "ওটা পকেটে পুরছেন যে ! আমার টিকিট আমাকে দিয়ে দিন। মাত্র তো চব্বিশ ঘণ্টা সময় চাইছি, এর মধ্যে ভেবেচিন্তে যা করার করব।"

টিকিটটা ফেরত দিয়ে রাঘব দত্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "পিজিয়ান চেস্টের লোকদের নিয়ে কিছু করা যায় না। ঠিক আছে। আমি আগামী কাল ঠিক এ-সময় আসব।" অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে মোড় ঘুরতেই শুভ্র ন' নম্বর ছবি তুলে ফেলল।

রাঘব দত্ত বেরিয়ে যাওয়ার আগেই শুভ্র এই প্রথম বাড়ির কাউকে না জানিয়ে ক্যামেরা সঙ্গে করে দৌড়ে রজতের বাড়ি এসে পৌঁছল। ভীষণ হাঁপাচ্ছিল শুভ্র। এ-সময় রজতের বাবা রাজীববাবু জগিং করছিলেন।

ওকে অমন অবস্থায় ছুটে আসতে দেখে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার শুভ্র ?"

ক্যামেরাটা এগিয়ে দিয়ে শুভ্র হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "এটা আপনার কাছে রাখুন। ছোটকাকা শিগগিরই মস্ত

বিপদে পড়বেন।"

রাজীববাবু একটুও উদ্বেগ প্রকাশ না করে বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।"

শুভ্রকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে চলে এলেন। দরজা বন্ধ করে শুভ্রর কাছ থেকে সব শুনে বললেন, "রাঘব দত্ত আগামীকাল আর আসবেন না। ফিল্ম আমি বের করে নিচ্ছি। তুমি এবার বাড়ি যাও। যা করবার আমি করব। ভাল কথা, কাউকে এ-বিষয়ে কিছু বোলো না।"

শুভ্র সে-কথায় সম্মতি জানিয়ে খালি ক্যামেরা সঙ্গে করে ফের দৌড়ে বাড়ি এসে পৌঁছল।

শুভ্রর খুব দুঃখ হচ্ছিল, টেপ-রেকর্ডার নেই বলে। থাকলে, রাঘব দত্ত আর ছোটকাকার সব কথাও টেপ করে রাখতে পারত। বাড়ি এসে দেখল, ছোটকাকা ভীষণ অন্যমনস্ক। ওর ভয় হচ্ছিল, ও যখন রজতের বাড়ি গিয়েছিল, সে-সময় ছোটকাকা টাকার লোভ সামলাতে না পেরে টিকিটটা হাতছাড়া করে দেননি তো! কী অজুহাতে টিকিটের কথা তোলা যায়, সে কথাই ভাবছিল শুভ্র।

মা বললেন, "স্কুল যাবার সময় হল যে।" শুভ্র ইচ্ছে করেই শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। বড় করে হাই তুলে বলল, "শরীরটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে। ভাবছি, আজ আর স্কুল যাব না।"

শুভ্রর মা অমনি বলে উঠলেন, "ঘন-ঘন স্কুল কামাই করলে চলবে কী করে? সেদিন ওই বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেললি। কোথায় এখন সাবধানে থাকবি তা নয়, যত পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে, ততই দেখছি তোর পড়ায় অমনোযোগ।" বলেই কপালে হাত ছোঁয়ালেন। ভিজে হাতে কপালে হাত দিয়েছিলেন বলে, কপালটা সত্যি গরম-গরম ঠেকল। শুভ্রর মা বললেন, "তাই তো দেখছি। শরীরটা ছ্যাঁত-ছ্যাঁত করছে। শুয়ে থাক। ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে নে। দুপুরে ভাত না খেয়ে দুটো রুটি খাস।"

শুভ্র মাকে গোপন করে হাসল। গরম লাগছিল ভীষণ। তবু পাতলা একটা চাদর গায়ের ওপর ফেলে টানটান হয়ে শুয়ে রইল।

॥ ৮ ॥

বেলা বারোটা নাগাদ পর-পর দুটো সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে থামল একটা বাড়ির সামনে। এর বেশ পেছনে-পেছনে একটা পুলিশ-ভ্যান। গেটে দরোয়ান দাঁড়িয়ে। বাড়িটার নাম 'সুখধাম'। মাধবীলতার ঝোপ দেয়াল বেয়ে উঠেছে। ভেতরে নুড়ি-পাথর বিছানো পথ। পথের দুপাশে নানান রঙের সুন্দর-সুন্দর ফুলের গাছ। দেয়ালের গায়ে লেখা আছে ডঃ সন্তোষ মিত্র। পুলিশের কালো ভ্যান বাড়ির বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

সাদা পোশাকের একজন অফিসার দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তোষবাবু বাড়ি আছেন?"

"জি সাব।"

দরোয়ান দরজা খুলে দিতেই অ্যাম্বাসাডার দুটো বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

সন্তোষ মিত্র ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। রোজকার মতো খাওয়া-দাওয়ার পর ইংরেজি নভেল পড়ছিলেন।

গাড়ি থেকে অফিসাররা নেমে ওঁর সামনে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?" একজন সাদা পোশাকের ভদ্রলোক বললেন, "আমরা ইনকাম ট্যাক্স থেকে আসছি। আপনার কোম্পানির খাতাপত্তর যা-যা বাড়িতে আছে, সে-সব আমরা সিজ করব। এছাড়াও বাড়িখানা তল্লাশি করব।"

"হোয়াট!" রাগী গলায় সন্তোষ মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। "আমার বাড়ি সার্চ হবে, এ কি মগের মুল্লুক? আপনাদের আইডেনটিটি

Duckback®

স্কুল ব্যাগ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

Duckback মানেই সবার সেরা

naa.BWL 8311

কোথায় ? ওয়ারেন্ট না দেখালে তো বাড়িতে আপনাদের আমি ঢুকতে দেব না।"

পাকা কাজ করেই অফিসাররা এসেছিলেন। পদস্থ একজন অফিসার বললেন, "এত উত্তেজিত হবেন না মিঃ মিত্র।" ওয়ারেন্ট আর আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে, সময় নষ্ট না করে, অফিসাররা বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলেন।

আলমারি, ড্রয়ার সব খুলে বিদেশী নানান জিনিস সংগ্রহ করে একজন অফিসার সন্তোষ মিত্রকে বললেন, "দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কিনা।"

"চিনব না কেন ? এ তো আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি অনিমেষ ঘোষাল। তা ও কী করেছে ?"

একজন অফিসার দ্রুত ভঙ্গিতে এসে পদস্থ অফিসারকে বললেন, "বাথরুমের দেয়াল ভাঙতেই শুধু একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল দেখতে পাচ্ছি স্যার।"

ঠিক সেই সময় রাজীববাবু পুলিশ ফোর্স নিয়ে রাঘব দত্ত ওরফে অনিমেষ ঘোষালকে অ্যারেস্ট করে এ-বাড়িতে ঢুকে বললেন, "জিনিসপত্র আমরা সব সিজ করছি। ডঃ মিত্র, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।"

বাইরে তখন অজস্র লোকের ভিড়। খবরের কাগজের লোকজনও এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। ক্যামেরাম্যানও আছে অনেক। রিপোর্টারদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন রাজীববাবু। বললেন, "ইট্স এ থ্রিলিং স্টোরি। আর এর মূলে যে আছে, সে না থাকলে আমরা কোনোদিনই হয়তো এত বড় একটা ব্যাপার ধরতেই পারতাম না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ব্ল্যাক মানি ড্রাইভ দেওয়ার ব্যাপারে আমরা সত্যি কিছু করতে পারছিলাম না। সন্তোষবাবুর মতো সমাজের রেসপেক্টেবল লোক যে এইসব হীন চক্রান্তের মধ্যে আছেন, তা আমরা কোনোদিনই কল্পনা করতে পারি না। এ বাড়ি থেকে আমরা ক্যাশ দশ লক্ষ টাকা পেয়েছি। বিদেশি জিনিসপত্তরও পেয়েছি বেশ কয়েক লক্ষ টাকার। এছাড়াও দামি স্টোন—যার বাজারদর অন্তত কুড়ি লক্ষ টাকার মতো হবে, তাও উদ্ধার করেছি। এখানে আর বেশি কিছু বলা যাবে না। যা হবে, সব আদালতই বিচার করবে। তবে হ্যাঁ, আজকের এই সাকসেসের পেছনে শুভ্রপ্রকাশ রায় বলে একটি ছেলের কৃতিত্বই বেশি। যে নিজের কাকার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে দেখে বিচিত্র কায়দায় সব কিছু হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে। শুভ্রপ্রকাশের বাড়ি এখন কড়া পুলিশের নজরে রয়েছে। এই ঠিকানা দিচ্ছি। ওখানে গিয়ে ওর কাছ থেকেই সব জানতে পারবেন।"

ঘন ঘন ক্যামেরায় ছবি উঠতে লাগল। একসময় রাজীববাবু রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানদের দিকে চেয়ে বললেন, "প্লিজ, আপনারা এখন আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। বিকেল চারটেতে হেডকোয়ার্টার্সে গেলে আমি খুলে সব বলতে পারব। এ-বাড়ি থেকে যা-যা নিচ্ছি সাক্ষীসাবুদ রেখে, আর লিস্ট এবং অ্যাকচুয়াল ভ্যালুয়েশান নোট করতে হবে। শুধু জেনে যান, এই কেসটা ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার একটা সুন্দর কাহিনী। আর এর পেছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান সে হচ্ছে ক্লাস টেনের একটি ছেলে—যার নাম আগেই আপনাদের বলেছি।"

খাতাপত্র সব সিজ করে ইনকাম-ট্যাক্সের লোকজন দিয়ে আলমারি, লকার, ড্রয়ার ভাল করে সিল করে ফেললেন। এতে সময় লাগল প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক।

এবার সন্তোষ মিত্র আর রাঘব দত্ত ওরফে অনিমেষ ঘোষালকে অ্যারেস্ট করে যখন গেট পার হয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছিল, সে সময় দু-একজন খবরের কাগজের ক্যামেরাম্যান ফ্ল্যাশ-বাল্বে বেশ

কয়েকটা ছবি তুলে নিলেন। সন্তোষ মিত্র মুখ ঢাকলেন হাত দিয়ে, যাতে করে পরের দিন খবরের কাগজে ছবি বেরোলেও কেউ তাকে ঠিক-ঠিক চিনতে না পারে এজন্য।"

পাড়ার লোকজন অবাক চোখে সব কিছু দেখল। বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করতে করতে যে যার কাজে চলে গেল। দরোয়ান শুধু গেট আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক চারটের সময় রিপোর্টাররা এসে হাজির হেড কোয়ার্টার্সে। রাজীববাবু প্রসন্ন হেসে বললেন, "জানেন তো ক্রাইম ডাজ নট পে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আসলে শুভ্রর কাকা অমিতজ্যোতি রায় রাজ্য লটারির একটা টিকিট কিনেছিলেন। আর সেটাতেই ফার্স্ট প্রাইজ উঠে যায়। সন্তোষ মিত্রর সেক্রেটারির কাজই ছিল, কী করে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করা যায়। এসব ব্যাপারে সেক্রেটারিটি খুবই চতুর। এর জন্য রাঘব দত্ত ওরফে অনিমেষ ঘোষাল ভাল রকম পার্সেন্টেজই ওর পকেটস্থ করত। এই যেমন এই কেসটা। এটায় সফল হলে, পঁচিশ হাজার টাকা নিজে আত্মসাৎ করত। ও এসে সন্তোষ মিত্রকে বলত এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকায় টিকিটটা হাতিয়েছে। আর সন্তোষ মিত্রও দেখত, ওর ওই টাকার বিনিময়ে সাতানব্বই-আটানব্বই হাজার টাকা হোয়াইট করতে পেরেছে। কী চতুর আর বুদ্ধিমান ওরা। সাধারণ মানুষ—সে সৎ হলেও প্রলোভন থেকে অনেক সময় মুক্ত হতে পারে না। অমিতজ্যোতি রায়ও প্রায় রাজিই হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর ভাগ্য ভাল, রাঘব দত্তের কথায় উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হননি। চব্বিশ ঘণ্টার সময় নিয়েছিলেন। আসলে উনি চেয়েছিলেন, এর থেকে বেশ কিছু টাকা খরচ করে একটা স্টুডিও খুলবেন আর কিছু টাকা বিশেষ একটা সেবা-প্রতিষ্ঠানে দান করবেন। একদিকে

কলকাতার ইতিহাস

শীতকালই হচ্ছে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ঋতু। একথায় কারও দ্বিমত নেই তো?

যদিও এসময় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে সময় চলে যায় তোমাদের, তবু যখন পরীক্ষার শেষে পিঠে রোদ নিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে তোমরা মাঠে, ঘাটে, পার্কে, রাস্তায় নেমে পড় তখন বড়দেরও তোমাদের দেখে প্রাণটা হাল্কা হয়। পুরোনো দিনের স্মৃতি, খেলার মাঠ সব মনে পড়ে তাঁদের। মনে পড়ে সুন্দর কলকাতার ছবি। সুন্দর, ছোট্ট কলকাতা। লোক কম, ভীড় নেই, সাজানো গোছানো। অবাক লাগে ভাবতে কোথায় গেল সেই কলকাতা আজকের এই কলকাতার ভীড়ে?

কোথাও যায় নি। "কলকাতা আছে কলকাতাতেই"। শুধু বদলে গেছে তার চেহারা, তার বয়স, তার উপযোগিতা। আজকের বড়দের ছোটবেলার কলকাতা, স্বাধীনতার আগের কলকাতা ছিল সাহেবদের বন্দর। ভারত থেকে মাল লুটে নেবার শহর। আজ তার ভূমিকা বদলে গেছে। বদলে হয়েছে সব রকম মানুষের রুজি-রোজগারের শহর। দূর দুরান্ত থেকে আসা মানুষের অন্নের সংস্থান। সেই সঙ্গে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সব শ্রেণীর মানুষের সহ অবস্থানের শহর আজ কলকাতা। শীতের ছুটিতে খেলাধুলো তো আছেই, সেই সঙ্গে এই কলকাতা শহর সম্পর্কে জানতে হবে তোমাদের। বই জোগাড় করে পড়া চাই। জানা দরকার এই সংগ্রামী শহরটার ইতিহাস কি? এ বিষয়ে বড়দের সাহায্যও চাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে নীচের ঠিকানায় চিঠি লিখে জেনে নাও সব।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত)

মহৎ ভাবনা আর একদিকে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনটাকে বেছে নেবেন, এই দোটানায় পড়েছিলেন। সে জন্যই সময় চেয়ে নেওয়া। ওঁর বুদ্ধিমান ভাইপো শুভ্রপ্রকাশের প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল রাঘব দত্তের ওপর। তাই ও বৈঠকখানায় রাঘব দত্তকে বসতে বলে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়েছিল। নিতান্তই কৌতূহলবশত ও ওর কাকা আর রাঘব ওরফে অনিমেষ ঘোষালের বিভিন্ন মুভমেন্টের ছবি একের পর এক তুলে ফেলেছিল। শুভ্রর বন্ধু হচ্ছে আমার ছেলে। ওর জন্মদিনে আমার ছেলে ওকে কালার ফিল্ম উপহার দিয়েছিল। ফলে, ছবিগুলো সুন্দর ডিটেলসে উঠেছে। এই দেখুন,এই ছবিটা। এটা রাঘব দত্ত যখন প্রথম ওদের বাড়ি ঢোকে তার ছবি। আর এই ছবিটায় রয়েছে, রাঘব দত্ত বাঞ্চ-বাঞ্চ টাকা টেবিলে রেখে অমিতজ্যোতিকে প্রলুব্ধ করছে। দেখুন, ভাল করে দেখুন। এ সময় অমিতজ্যোতিবাবুর চোখ-মুখের চেহারা কী রকম হয়েছিল। এই সেই টিকিট—যেটা রাঘব দত্ত যখন পকেটস্থ করতে যাচ্ছিল তখনকার। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, শুভ্রর মতো খুদে ক্যামেরাম্যানের বুদ্ধি আজ শুধু ওর কাকাকেই বাঁচায়নি, দেশের কত বড় শত্রুকে ও ধরিয়ে দিয়ে কত বড় উপকারই না করল।"

সমস্ত ঘটনা ঠিকঠাক ভাবে গুছিয়ে লিখে স্টাফ রিপোর্টার ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে করে শুভ্রর বাড়ি এল। শুভ্রর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিয়ে অমিতজ্যোতিকেও প্রশ্ন করল। রাজীববাবুর বলার সঙ্গে এতটুকুও অমিল হল না অমিতজ্যোতির কথার। শুভ্র একজন রিপোর্টারকে জিজ্ঞেস করল, "এবার ওই রাঘব দত্ত আর সন্তোষ মিত্রর কী হবে?" রিপোর্টার বললেন, "সে-সব আদালতে ঠিক হবে। অনেক ধন্যবাদ শুভ্র। তুমি একটু দাঁড়াও, আমরা তোমার ছবি তুলব।"

শুভ্র বলল, "ছোটকাকার ছবি থাকবে না?"

"নিশ্চয়ই থাকবে। আসুন অমিতজ্যোতিবাবু, আসুন।"

ফ্ল্যাশ-বাল্‌বে ঘন-ঘন ছবি তুলে ওঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন শুভ্রর ছবি সব খবরের কাগজে বেরুল। কোনো কাগজে বেরুল খুদে ক্যামেরাম্যানের কাহিনী, কোনো কাগজে বেরুল মুখোশের আড়ালে সন্তোষ মিত্র, কোনো কাগজে বেরুল শুভ্রপ্রকাশের অসামান্য কীর্তি। এক একটা কাগজে এক এক ধরনের ছবি শুভ্রর।

শুভ্র দেখে খুব উল্লসিত হলেও অমিতজ্যোতি মুখ ভার করে বসে রইলেন। শুভ্রকে লক্ষ করে বললেন, "এতগুলো ছবি তুলল, আমার একটাও ছাপল না।"

সৌরেনবাবু হেসে বললেন, "আমি হলে তোর ছবি ছেপে লিখতাম, লোভী অমিতজ্যোতি।"

শুভ্রর মা হেসে বললেন, "ঠাকুরপো শেষ পর্যন্ত তো রাঘববোয়ালের খপ্পরে পড়েনি।" ঠিক সে-সময় রাজীববাবু গাড়ি করে শুভ্রর বাড়ি এসে বললেন, "খুব মজা না শুভ্র? দেখলে তো আমরা চটপট কত কিছু করতে পারি।"

শুভ্রর মা বললেন, "অনেক হয়েছে। এবার ওকে একটু পড়াশুনোয় মন দিতে বলুন তো?"

সকলেই সে-কথায় হো-হো করে হেসে ফেললেও শুভ্র শুধু হাসল না। পরক্ষণেই দেখল, এক গুচ্ছ ফুলের তোড়া নিয়ে রজত হাসিমুখে কনগ্রাচুলেশানস জানাতে আসছে।

রজতের দিকে সে-সময় সকলেই চেয়ে ছিল। এবার শুভ্র মা-র দিকে চেয়ে না-হেসে পারল না।

ছবি : দেবাশিস দেব।

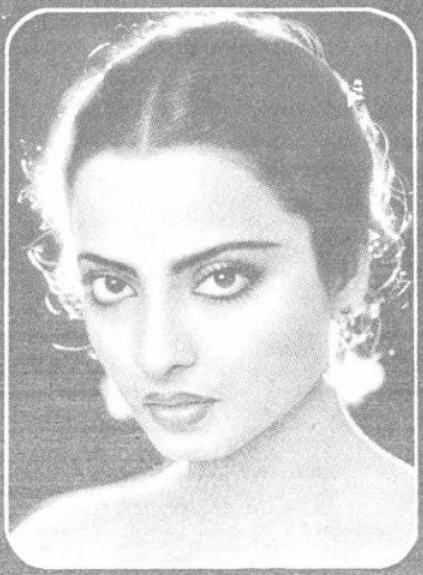

LUX
PINK
"লাক্সের নতুন রূপ...কতোই না অপরূপ!"
—রেখা
"আর লাক্সেরই সযত্ন
পরিচর্যায় আমার
রূপ-লাবণ্য থাকে মোলায়েম,
সুন্দর··· স্নিগ্ধ, কোমল।
লাক্স—আমার প্রিয় সৌন্দর্য
সাবান···এর নতুন রূপ,
আরো কতো অপরূপ!"
শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন
HTB-HLL.9261

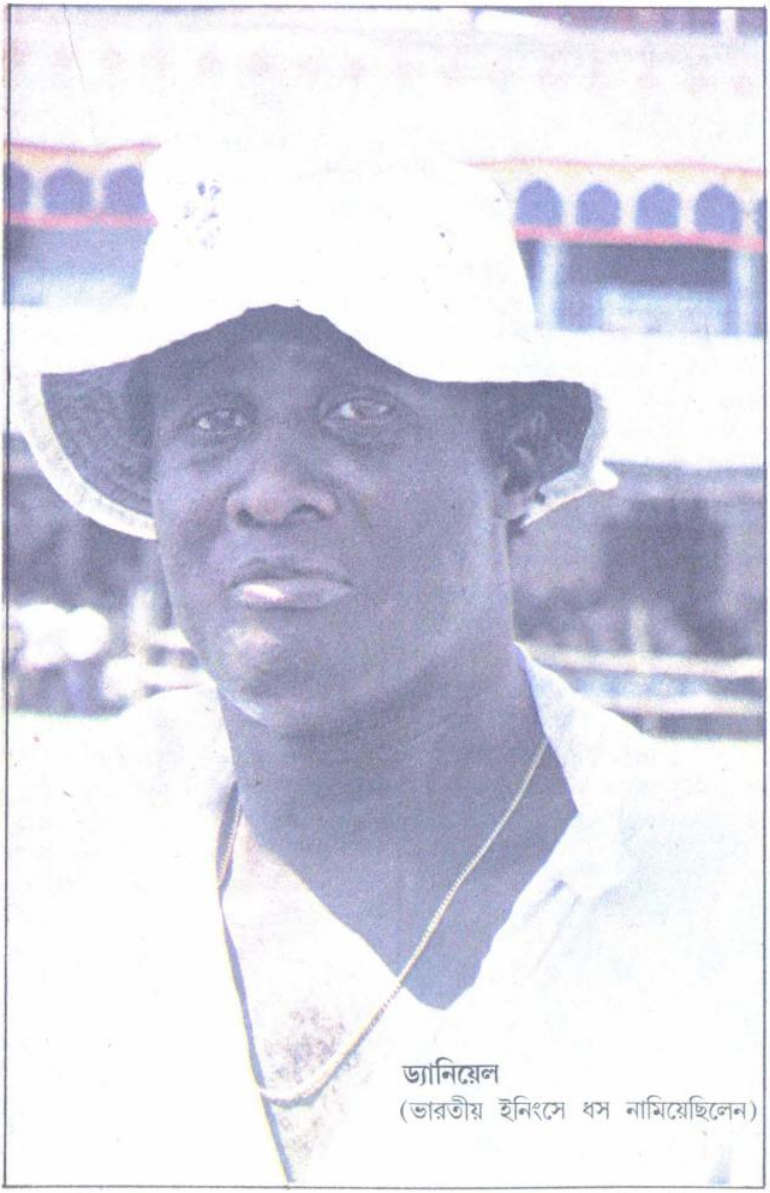

ড্যানিয়েল
(ভারতীয় ইনিংসে ধস নামিয়েছিলেন)

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ইডেনে : ফিরে চাও

মণীশ মৌলিক

১৯৪৮-৪৯ মরসুমে কলকাতার মানুষ প্রথম উপভোগ করেছিল ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ। জন গডার্ড এসেছিলেন ক্যারিবিয়ানদের অধিনায়ক হয়ে। এদিকে ভারতের নেতা লালা অমরনাথ। ইডেনে, তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন মারকুটে এভার্টন উইক্‌স্। ১৯৪৭-৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জামাইকাতে সেঞ্চুরির পর ভারতে এসে উইক্‌স্ দিল্লি ও বোম্বাইতে দুটি সেঞ্চুরি করেন। কলকাতায় দুই ইনিংসে শতরান করার ফলে, পর-পর পাঁচটি সেঞ্চুরি করার রেকর্ড তৈরি হয়। আজও তা অম্লান। ওরেল সে মরসুমে খেলেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্লাইভ ওয়ালকট ১০৮ রান করেছিলেন। ভারতের একমাত্র শতরানটি এসেছিল মুস্তাক আলির ব্যাট থেকে। ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল।

রোহন কানহাই (ইডেনে ২৫৬ রান)।

১৯৫৮-৫৯ সালে ইডেনে আবার মুখোমুখি হল দুই দেশ। মরসুমের তৃতীয় টেস্টকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর ব্যাটসম্যান রোহন কানহাই। ইডেনকে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল কানহাইয়ের (২৫৬) আনন্দমধুর ব্যাটিং। অতিরিক্ত পাওনা—বেসিল বুচারের ঝকঝকে ১০৩ এবং সোবার্সের ত্রুটিহীন অপরাজিত ১০৬। ভারতের দুই দফায় ধস নামালেন গিলক্রিস্ট ও হল। এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে হারল ভারত।

১৯৬৬-৬৭ মরসুমের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ফের হারল এক ইনিংস ও ৪৫ রানে। সি এ বি'র কর্মকর্তাদের দোষে খেলা মাঝপথে বন্ধ হতে বসেছিল। উচ্ছৃঙ্খল দর্শকরা আগুন লাগিয়েছিল স্ট্যাণ্ডে। ক্যাপটেন সোবার্স গোঁ ধরে বসেছিলেন, মাঠে নামবেন না। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্ক ওরেলের কথায় সোবার্স খেলতে রাজি হলেন।

১৯৭৪-৭৫ সালে অধিনায়ক হয়ে এলেন ক্লাইভ লয়েড। কলকাতায় পঁচাশি রানে হার স্বীকার করতে হল তাঁকে। শেষ দিনে একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচ জিতে গেলেন পতৌদি। মুঠো থেকে প্রায় বেরিয়ে যাওয়া ম্যাচ, দারুণ বল করে নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন চন্দ্রশেখর। বেদিও চমৎকার বল করেছিলেন। সে ম্যাচে 'লিটল মাস্টার' গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের অনবদ্য সেঞ্চুরি (১৩৯) বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৭৯ সালে কালীচরণ এলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর দল নিয়ে। অবশ্য এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। নামীরা সবাই তখন কেরি প্যাকারের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ইডেনে অল্পের জন্য হারের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কালীচরণ।

বোলার এখন ম্যানেজার

অশোক রায়

এটা মানতেই হবে যে, প্রশ্নটা শুনেই প্রবীণরা স্মৃতিতে ডুব দেবেন। এবং অতীত হাতড়ে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই দু'দিকে মাথা নেড়ে বলতে বাধ্য হবেন যে, এমন ভয়ংকর দৈত্যাকার ফাস্ট বোলার কলকাতায় কখনও আসেনি। সেই গতিময় বিভীষিকাটির নাম ওয়েসলি হল।

তখনকার দিনে ইডেনে নেটের পেছনে বসে সফরকারি দলের প্র্যাকটিস দেখার সুযোগ ছিল। খুব কাছ থেকেই দেখেছি হলকে। গলায় একটা সাদা রুমাল বাঁধা, ঘামে ভেজা কালো মুখে বিকেলের আলো পিছলে পড়ছে। গলায় একটা চেনের সঙ্গে ঝোলানো 'ক্রস' রান-আপের তালে-তালে বুকের ওপর দুলছে। হয়তো লেংথ, লাইন, সুইং বা কিউরেসি ব্যাপারগুলো তখনও সঠিকভাবে হলের করায়ত্ত ছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র ভয়ংকর গতির ঝড়েই খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের।

হলের বৈদ্যুতিক অভ্যর্থনায় বিব্রত হয়েছিল পাকিস্তানও। লাহোরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম হ্যাট্‌ট্রিকটি করেছিলেন হল। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, এসব তেমন বড় চমক নয়, অগ্নিপরীক্ষাটা দিতে হবে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। না, সেখানেও নিরাশ করেননি হল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬০—৬১ সালের সেই ঐতিহাসিক 'টাই' টেস্টের

হল বল করছেন

'ফিল্ম' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন মেলবোর্নে শেষ-বিকেলের আলোয় ওয়েসলি হলের শেষ ওভারের সেই ভয়ংকর রুদ্রমূর্তিকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দলের এক নম্বর উইকেট-শিকারির নাম—ওয়েস হল।

ভারত আরেকবার হলের হলাহলের সম্মুখীন হয়েছিল ১৯৬২ সালে। সিরিজে ভারতের লজ্জাজনক পরাজয়ের মূলে ছিল হলের বিধ্বংসী পেস আক্রমণ। সিরিজে ২৭টি উইকেট নিয়েছিলেন হল।

এককালে যে-নামে ভারতীয়দের মনে ছিল রাশ-রাশ চিন্তা, আতঙ্ক, সেই নামের মানুষটি এবার আবার ভারতে এসেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ম্যানেজার হিসেবে। তোমরা অনেকেই তো এবারে ইডেনে খেলা দেখছ; খেলার সঙ্গে সঙ্গে কেউ-কেউ হয়তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই ম্যানেজার-মশাইকেও দেখে থাকবে।

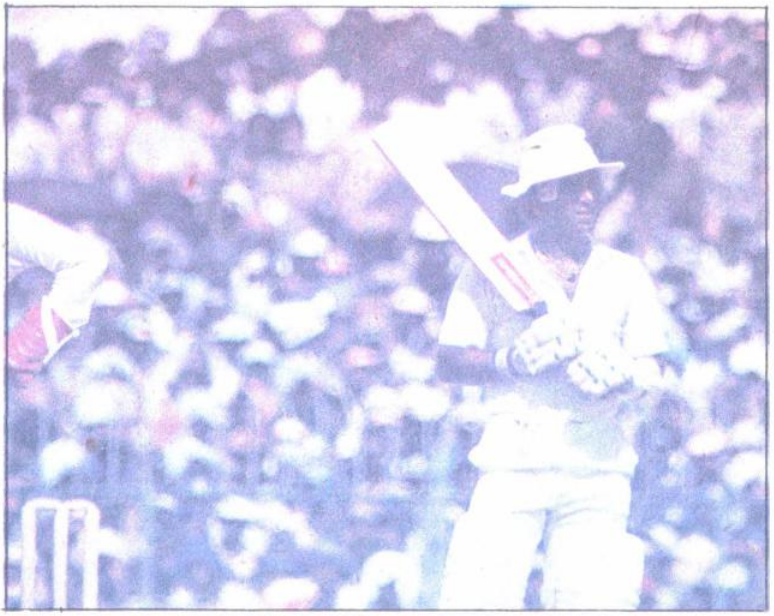

গাওসকর (রেকর্ডের পর রেকর্ডের পর রেকর্ড) ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

উইকেটের ছড়াছড়ি

মণি শর্মা

আমেদাবাদে চতুর্থ দিনে খেলা শেষ হওয়ার কিছু পরে জাতীয় নির্বাচন সমিতির সদস্যরা এবং বহু সাংবাদিক কৌতূহলী হয়ে পিচ দেখতে গিয়েছিলেন। খুঁটিয়ে দেখেও তেমন কোনো ভয়ঙ্কর ক্ষতের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কী আশ্চর্য! দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে যাচ্ছেতাইভাবে ধসে পড়তে দেখে প্যাভিলিয়নে বসে প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, মাইকেল হোল্ডিং একটি বিচিত্র 'স্পটের' যথোচিত ব্যবহার করছেন। এবং হোল্ডিংয়ের কাছে মাথা নুইয়ে তাঁকে উইকেট উপহার দিয়ে গেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। দুজোঁর ৯৮ রানের চমৎকার ইনিংস, গাওসকরের ৯০ রানের গা-গরম-করা খেলা বা কপিলের নয় উইকেট এ-সবের চাইতে এ-টেস্টকে আমি মনে রাখব ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অদ্ভুত আত্মহত্যার কারণে। না দেখলে এমন হারাকিরি বিশ্বাস করা যায় না!

ভারতের প্রথম ভুল টসে জিতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ব্যাট করতে দেওয়া। কপিলদেব অবশ্য বলেছেন, ব্যাট না করে তিনি ভুল করেননি। গুজরাট স্টেডিয়ামের নতুন পিচে কপিল বোধহয় প্রথমে খেলার ঝুঁকি নিতে চাননি। যাই হোক, ক্যারিবিয়ানদের ওপেনিং জুটি এবং মূল খুঁটি রিচার্ডসকে অল্প রানে ফিরিয়ে

দিয়ে বিনি ভারতীয় শিবিরে উল্লাসের হাওয়া বইয়ে দেন। তার পর পিঠের ব্যথায় কাতর বিনি প্রস্থান করতেই দায়িত্ব নেন মনিন্দার। সবাইকে আশ্চর্য করে ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে বল পিচে পড়ে ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যান গোমস, লয়েড ও লোগি। অবশ্য ডুবে যাওয়ার আগে গোমস ও লয়েড দলকে কিছুটা ভদ্র অবস্থায় তুলে আনেন। মার্শালকেও ঝুলিতে ভরে ফেলেন মনিন্দার। এসে থেকেই দুজো মেরে খেলছিলেন। প্রায় নির্ভুল আক্রমণাত্মক খেলা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। ৯৮ রানে তিনি যখন শাস্ত্রীর বলে ধরা পড়েন স্টেডিয়ামভর্তি লোক হায়-হায় করেছে। ধৈর্যচ্যুত হয়ে তিনি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। সম্মানজনক অবস্থায় শেষ হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস—২৮১।

একেবারে প্রথম বল থেকেই গাওসকর মারতে আরম্ভ করেন। নির্দয় প্রহার। থামে গিয়ে একেবারে নব্বুইয়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে। নির্ঘাত সেঞ্চুরিকে রুখে দেয় হোল্ডিংয়ের হঠাৎ-লাফানো বল। ততক্ষণে বয়কটের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে গেছে। এক বছরে হাজার রান পূর্ণ। এই নিয়ে চতুর্থবার হল। গায়কোয়াড় আগেই আউট হয়েছিলেন। ছটফট করে গেলেন নবজোৎ সিধু, হঠকারিতা করে পাটিল। ক্রমশ অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ল ভারত। ২৪১ রানে ইনিংস শেষ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুটি। হোল্ডিংয়ের বিজ্ঞ ব্যাটিং এবং কপিলের নয় উইকেট লাভ। স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের ক্ষয়ে-যাওয়া দেখতে-দেখতে হোল্ডিং বোধহয় বিরক্ত হয়ে ঠিক করেন,

হোল্ডিং (ব্যাটেও কম যান না)

কেমনভাবে খেলতে হয় দেখানো দরকার। ৫৮ রানের ইনিংসে তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। ঠিক ২০১ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে যবনিকা পড়ে।

অর্থাৎ, ২৪২ করলে জিত। সবার মনে গোপন দামামা বাজছিল। ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানরা সেই দামামা থামিয়ে দেন। গায়কোয়াড়, কিরমানি ও মনিন্দার (!) ছাড়া সকলেই কম বেশি নিজের দোষে আউট হয়েছেন। পিচে ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, মনিন্দার দেখিয়েছেন, এখানেও ব্যাট করা যায়। তবে ছটফটানি চলে না। ১০৩ রানের মাথায় শেষ উইকেট খসে যাবার পরে লয়েড দুলকিচালে হেঁটে তাঁবুতে ফিরেছেন। নিতান্ত অঘটন না ঘটলে সিরিজটা বোধহয় তাঁর হাতেই থাকবে।

বরোদা-বিজয়

ব্যাট-বয়

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচের দিকে আমরা সবাই অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। কাশ্মীরে পরাজয়ের শোধ কপিল বরোদায় তুলে নেবেন এমন ভেবেছিলেন অনেকেই। খেলার ধরনটা লয়েডের ব্যাট-হাতে আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ভারতের দিকেই ঝুঁকেছিল। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চল্লিশ বছর বয়সী সমর্থ অধিনায়ক ভারতীয় বোলিংকে চাবুক মেরে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। জয়লক্ষ্মী আস্তে আস্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে চলে যান।

ভারত তার পুরো শক্তি অবশ্য মাঠে হাজির করতে পারেনি। বেংসরকর অসুস্থ, গাওসকরের পায়ের পেশিতে টান ধরার ফলে অনুপস্থিত। শূন্যস্থান পূরণ

লয়েড (অধিনায়কের খেলা)

করলেন গায়কোয়াড় ও অশোক মালহোত্রা। কিন্তু ভারতের দুই ওপেনার প্রয়োজনীয় খেলা খেলতে পারলেন না। ঠুকঠুক করে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেওয়ার পর শাস্ত্রী-পাটিলের খেয়াল হয়, একদিনের আন্তর্জাতিক খেলা চলছে। শাস্ত্রী (৬৫) ম্যাচে সর্বোচ্চ রান করেছেন ঠিকই, তবে কখনো বোলারদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। মালহোত্রা ক্রিজে আসার পর রানের গতি বেড়ে যায়। উপযোগী ২৯ রান দিয়ে নিজের দাবিকে জোরদার করেছেন তিনি। ধারাবাহিক ভাল খেলার সুবাদে সম্প্রতি বিনি ভারতীয় দলের বড় খুঁটি। ব্যাটিংয়ে তিনি নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন (২২)।

মধ্যাহ্নভোজের আগে ৪৯ ওভারে ভারত ৬ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। উত্তরে খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গোড়া থেকে মারতে শুরু করে। প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান গ্রিনিজ ও হেনেস দ্রুত রান তুলতে থাকেন। হেনেসের পর রিচার্ডস এসে স্বস্তিতে ব্যাট করতে পারেননি। রানের হার তখন বেশ কমে গিয়েছিল। নড়বড়ে গোমস ২৬ রান করে ফিরে যান। দীর্ঘ সময় ধরে ভাল খেলে ৬৩ রান করার পর গ্রিনিজ একটা বাজে বলে আউট হন। তার পরের সময়টুকু লয়েড একাই, দলের জয়সৌধ গড়ার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। সাঁধুর বল পিটিয়ে ছাতু করে দেন তিনি। তাঁর দুই ওভারে ২৭ রান নিয়ে লয়েড ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। জয়ের মুহূর্তে লয়েড ক্রিজে ছিলেন না। কিন্তু প্যাভিলিয়নে বসে, নিজের হাতে-গড়া জয়সৌধের 'ফিনিশিং টাচ' নিঃসন্দেহে তিনি প্রাণ ভরে উপভোগ করেছেন।

চমৎকার খেলা, অথচ...

সুব্রত সিংহ

একটি অপ্রীতিকর ঘটনার ভেতর দিয়ে শেষ হল এবারের ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা। ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল কলকাতার দুই প্রধান—ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং। নামমাত্র গোলের ব্যবধানে জিতে ইস্টবেঙ্গল ১৯৮৩-র মরসুমে এককভাবে একটি ট্রফি জিতল। এর আগে অবশ্য তারা আই এফ এ শিল্ড পেয়েছিল এরিয়ানের সঙ্গে যুগ্মভাবে। এই নিয়ে সাতবার ইস্টবেঙ্গল এই ট্রফি জিতল।

প্রথমে গোলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রেফারি, কিন্তু পরে তিনি তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে মহমেডান দল একটি গোল করলে রেফারি কে· এন· মৌর প্রথমে গোলের বাঁশি বাজান। মহমেডানের খেলোয়াড়রা যখন গোল শোধের আনন্দে মত্ত সেই সময় ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন খেলোয়াড় লাইন্সম্যান শেঠির প্রতি রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করান। রেফারি তখন তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে গোলটি নাকচ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। দর্শকদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মহমেডানের খেলোয়াড়রা খেলতে অস্বীকার করায় রেফারি দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর মাঠ ছেড়ে চলে যান। এরপর প্রতিযোগিতা কমিটি প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে ইস্টবেঙ্গলকে জয়ী ঘোষণা করেন।

এবারের ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে খেলাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই খেলাটিকে প্রতিযোগিতার সেরা খেলাও আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু রেফারির একটি ছোট্ট ভুল এই উপভোগ্য খেলাটিকে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। একজন রেফারির উচিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে তাঁর সহকারীদের অনুধাবন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তা করেননি।

এবারের প্রতিযোগিতায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে, এবার কোনো বিদেশী দল ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। এবার বিদেশী দল বলতে অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া ও বাংলাদেশ থেকে একটি করে দল প্রতিযোগিতায় খেলেছিল। কিন্তু ভারতীয় দলগুলি এবার ট্রফি আর বিদেশে যেতে দেয়নি।

ইস্টবেঙ্গলের ট্রফি জয়ে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিংকম্যান প্রশান্ত ব্যানার্জি। তিনি এই প্রতিযোগিতায় উন্নত ক্রীড়ামানের নিদর্শন রেখেছেন। এই প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল যে পাঁচটি গোল করেছে তার মধ্যে চারটি গোলই এসেছে তাঁর পা থেকে। এছাড়া তিনি দলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গলের মৃতপ্রায় দলটি যেন হঠাৎ কেমন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। ফাইনালে তিনি যে গোলটি করেন, সেদিন আম্বেদকর স্টেডিয়ামের উপস্থিত দর্শকরা সেই গোলটি সম্পর্কে বহুদিন স্মৃতিচারণ করবেন।

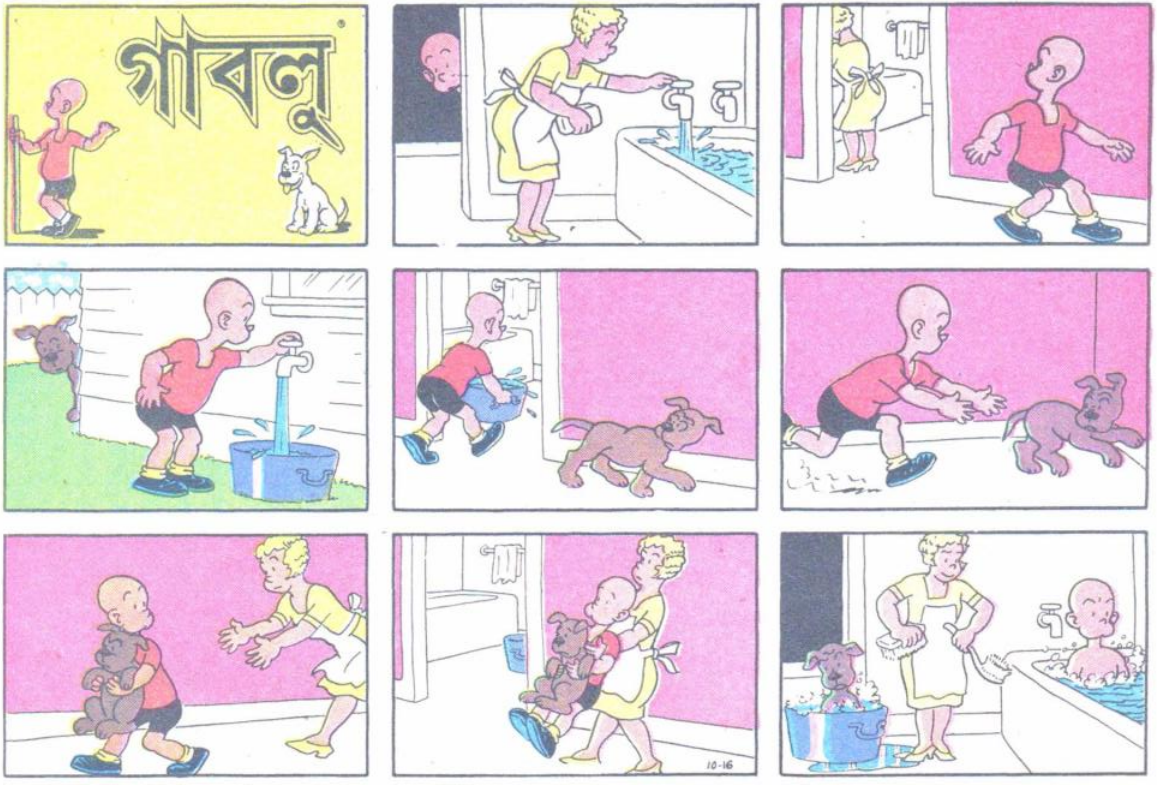
গাবলু
10-16

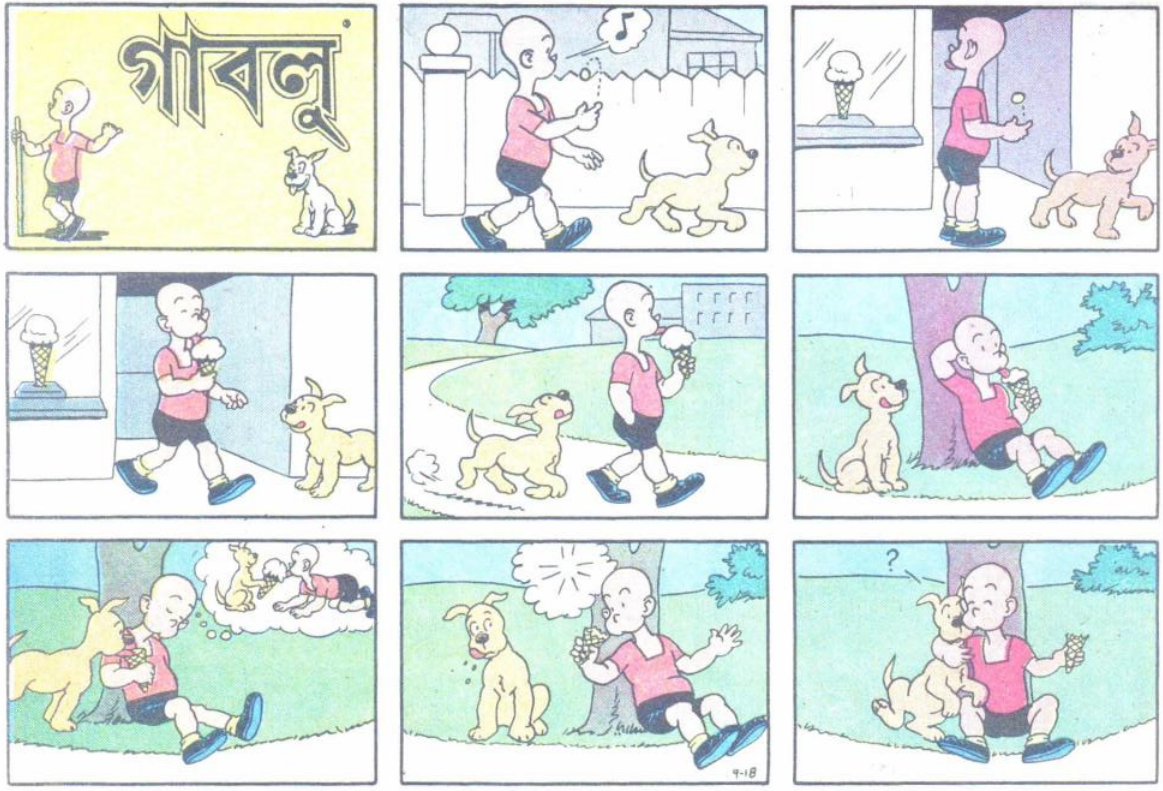
গাবলু

GKBE 882 86 BN

পুরনো ছবি

প্রসাদ

সেদিন মা পুরনো অ্যালবামখানা বের করে বসতেই চামেলি মা'র গা ঘেঁষে এসে বসল, তারপর চম্বল এল, তারপর বাবাও এসে পেছন থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করলেন।

There was something of interest on every page of the album.

Mrs. Roy turned the page, and there was Milly, a chubby little girl, all smiles.

Mr. Roy remembered, he used an old German camera those days.

"How sharp and clear the pictures came out!" he thought.

Now-a-days people use cameras which do everything for you.

You just press the shutter, and there you are.

With Mr. Roy's old camera, a great deal depended on him.

"That's why," Mr. Roy thought, "it used to give me so much satisfaction when the picture came out really well."

মিলির বাবা তাঁর পুরনো ক্যামেরার কথা ভাবছেন, আর মিলি ভাবছে, ছোটবেলায় আমি এমনি দেখতে ছিলাম নাকি ?

"Is that what I used to look like?" Milly thought.

"Milly looked like a doll when she was a baby, didn't she, Mummy?" Chambal asked.

"That's what people used to say about her, didn't they?" Mrs. Roy asked Mr. Roy.

"Yes," Mr. Roy said, "I often used to hear people say that."

"Look at Chambal here," Mummy said, "on his rocking horse. Do you remember how difficult it used to be to get him to get off his rocking horse?"

Daddy said, "I do. It never used to be easy to make Chambal do something he didn't like."

এবারে এই বাক্য দুটো লক্ষ করো :

1) He used an old German camera.

2) People use cameras that do everything for them.

তারপর এই বাক্যগুলো দ্যাখো :

3) That's why it used to give me so much satisfaction.

4) Is that what I used to look like?

5) That's what people used to say, didn't they?

6) I often use to hear people say that.

7) It never used to be easy to make him do that.

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে এই ক্রিয়াপদটি আছে : To use (past tense: used)

শেষের পাঁচটি বাক্যে যে শব্দদুটি লক্ষ করবার, সে দুটি হল : used to.

মনে রাখবে, এই শব্দজোড়ার ব্যাপারে কখনও কোনও বদল হয় না, এর কোনো ভবিষ্যৎ কিংবা বর্তমানকালের রূপ নেই। এর মানেও আলাদা, তার সঙ্গে 'ব্যবহার করা'-র কোনো সম্পর্ক নেই। উচ্চারণেও একটু তফাত আছে :

to use ('s' sounded as 'z')
used to ('s' sounded as 's')

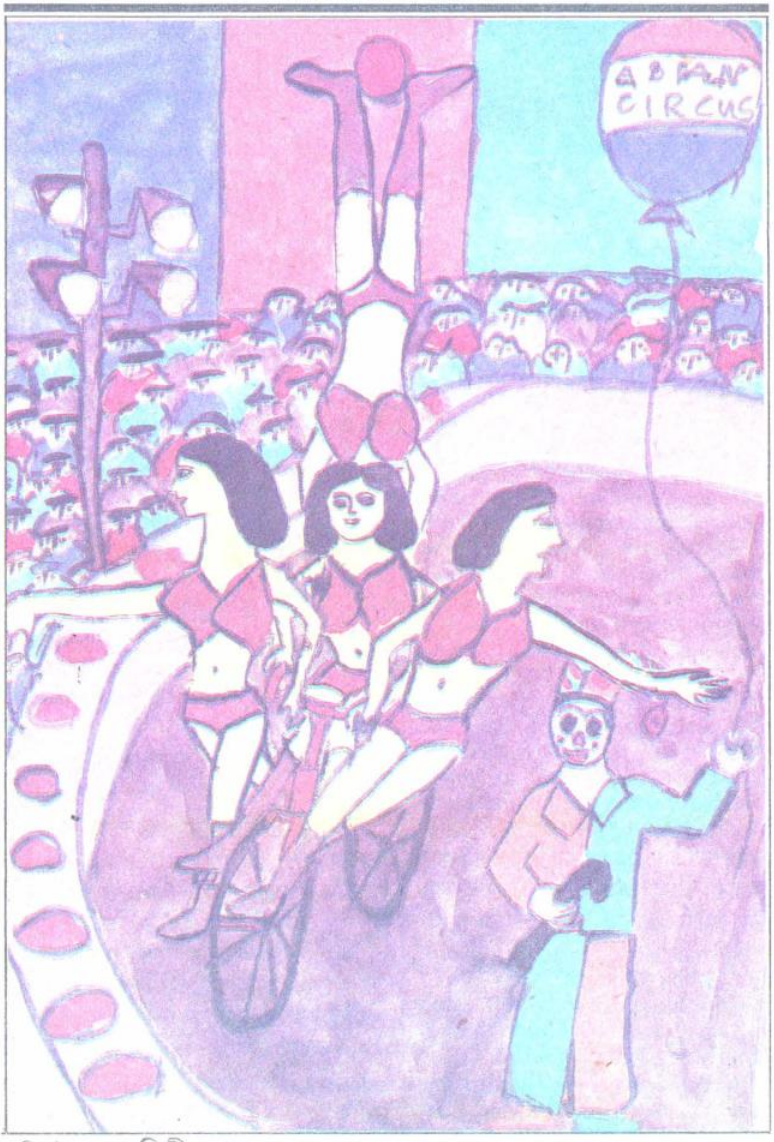

ছবি এঁকেছে **নন্দিনী লাহা** (বয়স ৮)

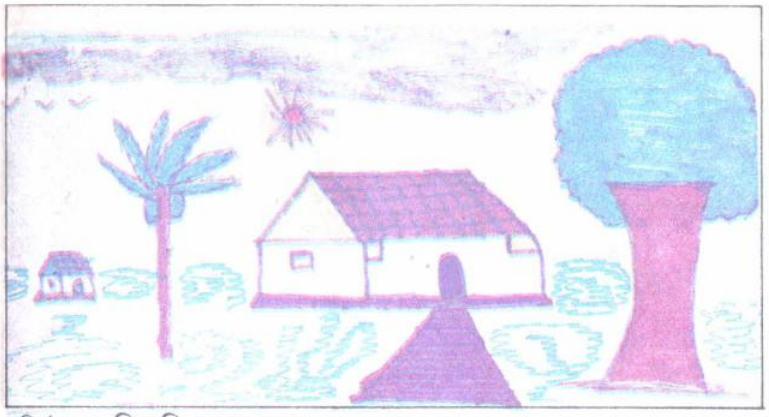

ছবি এঁকেছে **পিয়ালি মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৬)

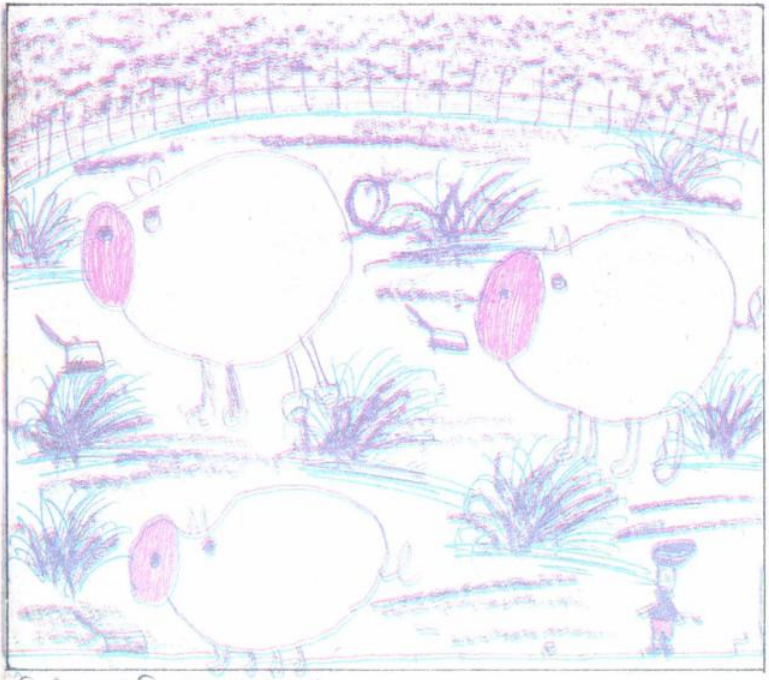

ছবি এঁকেছে **অদ্রি গুহ** (বয়স ৫)

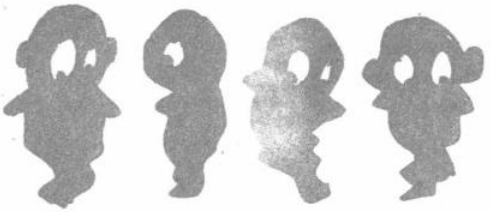

হাত বাড়ালেই ভূত

ভূতেরা কোথায় থাকে ? এর উত্তরে ভূত-বিশ্বাসীরা হয়তো উল্টো প্রশ্ন করবে, ভূতেরা কোথায় না থাকে ? কিন্তু ভূতে বিশ্বাসী যারা তারাও যেমন, তেমনি ভূতে যাদের অবিশ্বাস তারাও সকলে, একটা কথা স্বীকার করবে যে, হাত বাড়ালেই ভূতের দেখা পাওয়া যায়—বইয়ের তাকে।

হ্যাঁ, বইয়ের তাকেই ভূত রয়েছে। একটু শুধু কাছে ডেকে নেওয়া। তাহলেই দেখবে নানা ধরনের ভূত এসে ঠিক হাজির। কেউ বা আলেয়াভূত, কেউবা পাখিভূত, কেউ ব্রহ্মদত্যি, কেউ নিপাট ভালমানুষ, কোনো ভূত অঙ্ক কষে দেয়, কোনো ভূত খুঁজে দেয় গুপ্তধন। আর এইসব নানান ধরনের নানান চেহারার নানান চরিত্রের ভূতেরা যেসব বইতে রয়েছে সেইসব বইয়ের নামগুলো শুনে রাখো।

মনোজ বসুর	**ওস্তাদ নটবর**	দাম	৬·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের	**টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা**	দাম	৮·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের	**আঁধার রাতের অতিথি**	দাম	৮·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	**পাঁচমুণ্ডির আসর**	দাম	৮·০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের	**গোঁসাই বাগানের ভূত**	দাম	৮·০০
	হেডস্যারের গুপ্তধন	দাম	৮·০০
লীলা মজুমদারের	**সব ভুতুড়ে**	দাম	১৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ,ফোন : ৩৪-৪৩৬২

মাছের সংসার

আমি মাছ পুষি, অর্থাৎ মাছ পোষাটা আমার শখ। আমার অ্যাকোয়ারিয়ামে নানা রকমের মাছ আছে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে মাছের দোকান। সেখান থেকে আমি মাছ কিনি। দোকানে আমি সাইকেল করে যাই। যে ভদ্রলোক মাছ বিক্রি করেন তাঁর নাম সুভাষ মিত্র। আমি সুভাষদা বলে ডাকি। আমি প্রায়ই তাঁর দোকান থেকে মাছ কিনি। এইরকমই একবার একজোড়া মাছ কিনেছিলাম এবং একটা খুব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

আমি সেবার একজোড়া মাছ কিনব বলে মা'র কাছ থেকে দুটো টাকা চাই। মা একটু বকাবকির পর আমাকে টাকা দুটো দেন। আমি সাইকেল চালিয়ে সুভাষদার দোকানে গেলাম। একজোড়া মাছ পছন্দ করলাম, নাম ব্ল্যাকমলি। কালো কুচকুচে রঙ।

বাড়ি ফিরে আমি মাছ দুটো মাকে দেখাতে গিয়ে দেখি প্যাকেটে ছোট-ছোট কী যেন নড়চড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল। দেখি, ব্ল্যাকমলির দশটা বাচ্চা হয়েছে।

শান্তনু গুপ্ত (বয়স ১৪)

দার্জিলিং ও টয়ট্রেন

আমি মা ও বাবার সঙ্গে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা হোটেলে উঠেছিলাম আমরা। রোজ বেড়াতে যেতাম। একদিন একটা চা-বাগানে গিয়েছিলাম। চা-গাছ দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এক জায়গায় দেখলাম, তিব্বতিরা ভেড়ার লোম থেকে সুন্দর উল তৈরি করছে।

আর একদিন খুব ভোরে জিপে চড়ে আমরা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিলাম। সূর্য যখন উঠল তখন সূর্যের আলোয় পাহাড়ের চূড়াগুলো লালে লাল হয়ে গিয়েছিল।

আমরা দার্জিলিং থেকে টয়ট্রেনে চেপে ফিরেছিলাম। টয়ট্রেনটি সত্যিই যেন খেলনাগাড়ি। বেশ হেলেদুলে চলে। এই ট্রেন থেকে যেখানে খুশি নামা যায়, আবার উঠে পড়াও যায় চট করে। আমার মনে হয়, এই টয়ট্রেনই দার্জিলিংয়ের প্রধান আকর্ষণ।

দেবযানী দাস (বয়স ৭)

ছবি : **রুদ্র চক্রবর্তী** (বয়স ১২)

আগে হারু আসুক।
এই তো এসে গেছে।
তাড়াতাড়ি পুকুরে চলো।
হারু পিছিয়ে পড়েছে।
তুই না, আগে হারু...
পুকুরে নামবে।
এখন বুঝলি?

হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

**"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও।
আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা
ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"**

নীল রঙের স্বস্তিক পপ্যুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চট্‌পট্‌ গুলে যায়।
- এতে অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিষ্কার ও ধব্‌ধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেণ্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক

পপ্যুলার

ডিটারজেণ্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা

স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben.

খেলার সময় শুধু মজা আর মজা
নয় কোনো পেটে কামড়, কনকন ব্যথা।
রাম ও শ্যাম আর
রুপোলী স্ট্রাইপ
পেটে ব্যথা? বলি, খেয়েছো-কি?
শুধু পপিন্স মিষ্টি!
অসম্ভব! দেখাও তো মোড়কটা...
হুম! রঙ তো, লাল, হলদে, কমলা...
সবুজ ও সাদা...
কিন্তু, কই রুপোলী দাগটা?
রুপোলী দাগ? সেটা কি জানিনা তো?
ভাই, তুমি বোকা বনেছো! এখন আসল পপিন্সের রঙ-চঙে প্যাকে, থাকবে রুপোলী স্ট্রাইপ খুবই ঝকমকে!
PARLE POPPINS
এরপর, পপিন্স কেনার আগে দেখেনাও আসল না নকল...
নইলে সইতে হবে পেট ব্যথার ধকল!
আসল পপিন্স চাকুম-চুকুম খাসা,
ফলের স্বাদের খাঁটি, মিষ্টিতে ঠাসা!
এখন, পার্লে পপিন্সের রোল করা প্যাকে, রুপোলী স্ট্রাইপটি দেখে নেব আগে!
PARLE POPPINS
everest/81/PP/103-bn.
পার্লে পপিন্স চাখবার আগে, রুপোলী স্ট্রাইপটি দেখে নাও আগে-ভাগে।
এখন, জালিয়াতদের কোনো চালাকি চলবে না।